বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



সিগনেট প্রেস । কলকাতা ২৩

ত্রয়োদশ সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৬৯
প্রকাশক
নন্দিনী গুপ্ত
২৫/২ কবি মহঃ ইকবাল রোড
কলকাতা ২৩
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
ছবি
শ্যামলকৃষ্ণ বসু
মুদ্রক
দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত।

তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি স্যার এইচ. এইচ. জনস্টন, রোসিটা ফরব্‌স্‌ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে, এই গল্পে উল্লিখিত রিখটারস্‌-ভেল্ড পর্বতমালা মধ্য-আফ্রিকার অতি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী, এবং ডিঙ্গোনেক (রোডেসিয়ন মনস্টার) ও বুনিপের প্রবাদ জুলু-ল্যাণ্ডের বহু আরণ্যঅঞ্চলে আজ প্রচলিত।

সেণ্টফ্র্যাঙ্কো সৌর স্তোত্রের অনুবাদটি স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কৃত।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাকপুর, যশোহর

১লা আশ্বিন ১৩৪৪

খুকুকে দিলাম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাকপুর, যশোহর

১লা আশ্বিন ১৩৪৪

চাঁদের পাহাড়

শঙ্কর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এইবার সে সবে এফ. এ. পাশ দিয়ে গ্রামে বসেছে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া।

সারা বৈশাখ এভাবে কাটাবার পরে একদিন তার মা ডেকে বললেন—শোন একটা কথা বলি শঙ্কর। তোর বাবার শরীর ভালো নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনা হবে কী করে? কে খরচ দেবে? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা ছাখ।

মায়ের কথাটা শঙ্করকে ভাবিয়ে তুললে। সত্যিই তার বাবার শরীর আজ কমাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠচে। অথচ করবেই বা কী শঙ্কর? এখন কি তাকে কেউ চাকরি দেবে? চেনেই বা সে কাকে?

আমরা যে সময়েয় কথা বলচি, ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরি। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকরির বাজার এতটা খারাপ ছিল না। শঙ্করদের গ্রামের এক ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটিতে পাটের কলে চাকরি করতেন। শঙ্করের মা তাঁর স্ত্রীকে ছেলের চাকরির কথা বলে এলেন, যাতে তিনি স্বামীকে বলে শঙ্করের জন্যে পাটের কলে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরদিন বাড়ি বয়ে বলতে এলেন যে শঙ্করের চাকরির জন্যে তিনি চেষ্টা করবেন।

শঙ্কর সাধারণ ধরনের ছেলে নয়। স্কুলে পড়বার সময় সে বারবার খেলাধুলোতে প্রথম হয়ে এসেছে। সেবার মহকুমার একজিবিসনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পায়। ফুটবলে অমন সেণ্টার ফরওয়ার্ড ও অঞ্চলে তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জুড়ি খুঁজে মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিং-এ সে অত্যন্ত নিপুণ। কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই. এম. সি. এ-তে সে রীতিমতো বক্সিং অভ্যাস করেচে। এই সব কারণে পরীক্ষায় সে তত ভালো করতে পারেনি, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু তার একটি বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তার বাতিক ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ও বড়-বড় ভূগোলের বই পড়া। ভূগোলের অঙ্ক কষতে সে খুব মজবুত। আমাদের দেশের আকাশে যে সব নক্ষত্রমণ্ডল ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে— ওটা কালপুরুষ, ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া, ওটা বৃশ্চিক। কোন মাসে কোনটা ওঠে, কোন দিকে ওঠে—সব ওর নখ-দর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখনি বলে দেবে। আমাদের দেশের বেশি ছেলে যে এসব জানে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময় সে একরাশ ওই সব বই কিনে এনেছে, নির্জনে বসে প্রায়ই পড়ে আর কি ভাবে ওই জানে। তারপর এল তার বাবার

অসুখ, সংসারের দারিদ্র্য এবং সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে চাকরি নেওয়ার জন্যে অনুরোধ। কী করবে সে? সে নিতান্ত নিরুপায়। মা-বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না। অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকরি নিতে হবে। কিন্তু জীবনের স্বপ্ন তাহলে ভেঙে যাবে, তাও সে যে না বোঝে এমন নয়। ফুটবলের নাম করা সেণ্টার ফরওয়ার্ড, জেলার হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ান, নামজাদা সাঁতারু শঙ্কর হবে কিনা শেষে পাটের কলের বাবু? নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে সকালের ভোঁ বাজতেই ছুটতে হবে কলে, আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা, ওদিকে সেই ছ'টার ভোঁ বাজলে ছুটি। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে। ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাকড়া গাড়ি টানতে যাবে?

সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই। নদীর ধারে নির্জনে বসে-বসে শঙ্কর এইসব কথাই ভাবছিল। তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর, দূর দেশে—শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্ট্যানলির মতো, হ্যারি জনস্টন, মার্কো পোলো, রবিনসন ক্রুসোর মতো। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরি করেছে—যদিও এ কথা ভেবে দেখেনি অন্য দেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালী ছেলেদের পক্ষে

তা ঘটা এক রকম অসম্ভব। তারা তৈরি হয়েছে কেরানি, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার জন্যে। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাতপথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান পর্যটক অ্যাণ্টন হাউপ্টমান লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্বত -- মাউনটেন অফ দি মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ। কতবার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের হাউপ্টমানের মতো সেও একদিন যাবে মাউনটেন অফ দি মুন জয় করতে।

স্বপ্ন ! সত্যিকার চাঁদের পাহাড় দূরের জিনিসই চিরকাল। চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে ?

সে রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল সে :

চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতির দল মড়-মড় করে বাঁশ ভাঙচে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দুজনে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে উঠেচে, চারধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্ট-মানের লেখা মাউনটেন অফ দি মুনের দৃশ্যের মতো। সেই ঘন বাঁশ বন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড়-বড় গাছ, নিচে পচাপাতার রাশ, মাঝে-মাঝে পাহাড়ের খালি গা, আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া শাদা ধবধবে চিরতুষারে

ঢাকা পর্বত-শিখরটি এক-একবার দেখা যাচ্ছে, এক-একবার বনের আড়ালে চাপা পড়চে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতির গর্জন শুনতে পেলে ··সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল, এত বাস্তব বলে মনে হল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানাব উপব উঠে বসল, ভোব হয়ে গিয়েচে, জানলার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরেব মধ্যে এসেচে।

উঃ, কি স্বপ্নটাই দেখেছে সে! ভোবের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয় বলে তো অনেকে।

অনেকদিন আগেকার একটা ভাঙা পুরোনো মন্দির আছে তাদের গাঁয়ে। বারভুঁইয়ার এক ভুঁইয়ার জামাই মদন বায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈবি করেন। এখন মদন রায়েব বংশে কেউ নেই। মন্দিব ভেঙেচুবে গিয়েছে, অশত্থ-গাছ, বটগাছ গজিয়েছে কার্নিসে—কিন্তু যেখানে ঠাকুরের বেদী তার উপরের খিলেনটা এখনো ঠিক আছে। কোনো মূর্তি নেই, তবুও শনি-মঙ্গলবারে পুজো হয়, মেয়েরা বেদীতে সিঁদুর-চন্দন মাখিয়ে রেখে যায়। সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত যে যা মানত কবে তাই হয়। শঙ্কর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরে একটা বটের ঝুরির গায়ে একটা ঢিল ঝুলিয়ে কী প্রার্থনা জানিয়ে এল।

বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দূর্বাঘাসের বনে বসে রইল। জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হলেও বনে ঘেরা, কাছেই

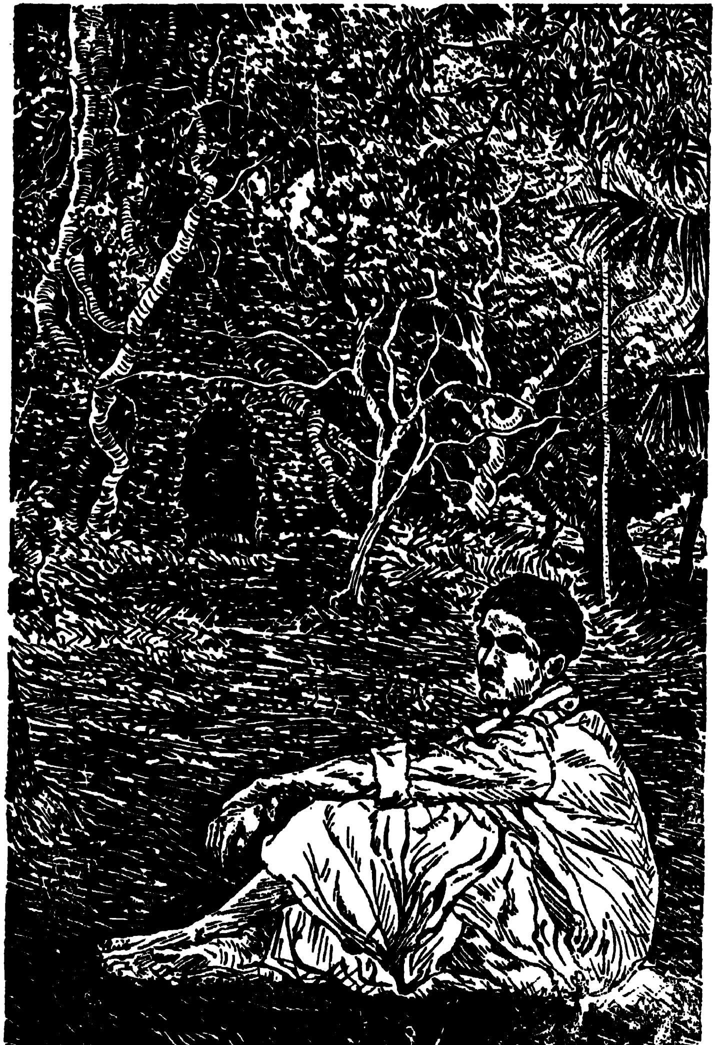
একটা পোড়ো বাড়ি ; এদের বাড়িতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের শিশুকালে—সেই থেকে বাড়ির মালিক এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করচেন। সবাই বলে জায়গাটায় ভূতের ভয়।··· একা বড় কেউ এদিকে আসে না। শঙ্করের কিন্তু এই নির্জন মন্দির-প্রাঙ্গণের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড় ভালো লাগে।

ওর মনে আজ ভোবের স্বপ্নটা দাগ কেটে বসে গিয়েচে। এই বনের মধ্যে বসে শঙ্করের আবার সেই ছবিটা মনে পড়ল—সেই মড়-মড় কবে বাঁশঝাড় ভাঙচে বুনো হাতির দল, পাহাড়ের অধিত্যকার নিবিড় বনে পাতা-লতার ফাঁকে-ফাঁকে অনেক উঁচুতে পর্বতের জ্যোৎস্নাপাণ্ডুর তুষারাবৃত শিখরদেশটা যেন কোন স্বপ্ন-রাজ্যের সীমা নির্দেশ করচে। কত স্বপ্ন তো সে দেখেচে জীবনে—অত সুস্পষ্ট ছবি স্বপ্নে সে দেখেনি কখনো, এমন গভীর রেখাপাত করেনি কোনো স্বপ্ন তার মনে।

সব মিথ্যে। তাকে যেতে হবে পাটের কলে চাকরি করতে। তাই তার ললাট-লিপি, নয় কি ?

কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা উপন্যাসে ঘটাতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে। শঙ্করের জীবনেও এমন একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল।

সকালবেলা সে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে সবে বাড়িতে পা দিয়েচে, এমন সময় ওপাড়ার রামেশ্বর মুখুয্যের



শ্রী একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বললেন—বাবা শঙ্কর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেকদিন পরে। ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়িতে চিঠি দিয়েচে, কাল পিণ্টু সেখানে থেকে এসেচে, এই তার ঠিকানা তারা লিখে দিয়েচে। পড় তো বাবা।

শঙ্কর বললে—উঃ, প্রায় দুবছরের পর খোঁজ মিলল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কি ভয়টাই দেখালেন। এর আগেও তো একবার পালিয়ে গেছলেন—না? তারপর সে কাগজটা খুললে। লেখা আছে—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগাণ্ডা রেলওয়ে হেড অফিস কনস্ট্রাকসন ডিপার্টমেণ্ট, মোম্বাসা, পূর্ব-আফ্রিকা।

শঙ্করের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা পড়ে গেল। পূর্ব-আফ্রিকা! পালিয়ে মানুষে এতদূর যায়? তবে সে জানে মনীবালাদিদির এই স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরনের। একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শঙ্করের আলাপও হয়েছিল, শঙ্কর তখন এনট্রান্স ক্লাশে সবে উঠেচে। লোকটা খুব উদার প্রকৃতির, লেখাপড়া ভালোই জানে, তবে কোনো একটা চাকরিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না, উড়ে বেড়ানো স্বভাব। আর একবার পালিয়ে বর্মা না কোচিন কোথায় যেন গিয়েছিল। এবারও বড়দাদার সঙ্গে কী নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার দরুন বাড়ি থেকে পালিয়েছিল এ খবর শঙ্কর আগেই শুনেছিল। সেই প্রসাদবাবু পালিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠেচে একেবারে পূর্ব-আফ্রিকায়!

রামেশ্বর মুখুয্যের স্ত্রী ভালো বুঝতে পারলেন না তাঁর জামাই কত দূরে গিয়েছে। অতটা দূরত্বের তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি চলে গেলে শঙ্কর ঠিকানাটা নিজের নোট বইয়ে লিখে রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসাদবাবুকে একখানা চিঠি দিলে। শঙ্করকে তাঁর মনে আছে কি? তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের ছেলে সে। এবার এফ. এ. পাশ দিয়ে বাড়িতে বসে আছে। তিনি কি একটা চাকরি করে দিতে পারেন তাঁদের রেলের মধ্যে? যতদূরে হয় সে যাবে।

দেড়মাস পরে, যখন শঙ্কর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েচে চিঠির উত্তর প্রাপ্তি সম্বন্ধে, তখন একখানা খামের চিঠি এল শঙ্করের নামে। তাতে লেখা আছে :

মোম্বাসা
২নং পোর্ট স্ট্রীট

প্রিয় শঙ্কর,
তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। কব্জির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে গিয়েছিলুম, সে কথা ভুলিনি। তুমি আসবে এখানে? চলো এসো। তোমার মতো ছেলে যদি বাইরে না বেরুবে তবে কে আর বেরুবে? এখানে নতুন রেল তৈরি হচ্ছে, আরও লোক নেবে। যত তাড়াতাড়ি পারো এসো। তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার আমি নিচ্ছি। তোমাদের—

প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি। যৌবনে তিনিও নিজে ছিলেন ডানপিটে ধরনের লোক। ছেলে পাটের কলে চাকরি করতে যাবে তাঁর এতে মত ছিল না, শুধু সংসারের অভাব অনটনের দরুন শঙ্করের মায়ের মতেই সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর মাস খানেক পরে শঙ্করের নামে এক টেলিগ্রাম এল ভদ্রেশ্বর থেকে। সেই জামাইটি দেশে এসেছেন সম্প্রতি। শঙ্কর যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রাম পেয়েই। তিনি আবার মোম্বাসায় ফিরবেন দিন কুড়ির মধ্যে। শঙ্করকে তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন।

॥ দুই ॥

চারমাস পরের ঘটনা। মার্চ মাসের শেষ।

মোম্বাসা থেকে যে রেলপথ গিয়েছে কিস্থমু-ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের ধারে—তারই একটা শাখা লাইন তখন তৈরি হচ্ছিল। জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে-তিনশো মাইল পশ্চিমে। ইউগাণ্ডা রেলওয়ের নুডসবার্গ স্টেশন থেকে বাহাত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখানে শঙ্কর কনস্ট্রাকসন ক্যাম্পের কেরানি ও সরকারি স্টোরকিপার হয়ে এসেচে। থাকে ছোট একটা তাঁবুতে। তার আশে পাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়িঘর তৈরি হয়নি বলে

তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো—তাদের চারধার ঘিরে বহু দূরব্যাপী মুক্ত প্রান্তর, লম্বা-লম্বা ঘাসে ভরা, মাঝে-মাঝে গাছ। তাঁবুগুলোর ঠিক গায়েই খোলা জায়গার শেষ সীমায় একটা বড় বাওবাব গাছ। আফ্রিকার বিখ্যাত গাছ, শঙ্কর কতবার ছবিতে দেখেচে, এবার সত্যিকার বাওবাব দেখে শঙ্করের যেন আশ মেটে না।

নতুন দেশ, শঙ্করের তরুণ তাজা মন, সে ইউগাণ্ডার এই নির্জন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খুঁজে পেলে। কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে পড়তো যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে বেড়াতে বের হত—পুবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। সব দিকেই লম্বা-লম্বা ঘাস, কোথাও মানুষের মাথা সমান উঁচু, কোথাও তার চেয়েও উঁচু।

কনস্ট্রাকসন তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিন শঙ্করকে ডেকে বললেন—শোনো রায়, ওরকম এখানে বেড়িও না। বিনা বন্দুকে এখানে এক পা-ও যেও না। প্রথম, এই ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পারো। পথ হারিয়ে লোকে এসব জায়গায় মারাও গিয়েছে জলের অভাবে। দ্বিতীয়, ইউগাণ্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে সিংহ হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েচে—কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই। খুব সাবধান! এ সব অঞ্চল মোটেও নিরাপদ নয়।

একদিন দুপুরের পরে কাজকর্ম বেশ পুরোদমে চলচে, হঠাৎ তাঁবু থেকে কিছু দূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্য-কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই সেদিকে ছুটে গেল ব্যাপার কি দেখতে। শঙ্করও ছুটল। ঘাসের জমি পাতিপাতি করে খোঁজা হল—কিছুই নেই সেখানে।

কিসের চিৎকার তবে?

এঞ্জিনিয়ার সাহেব এলেন। কুলিদের নাম-ডাক হল, দেখা গেল একজন কুলি অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল সে একটু আগে ঘাসের বনের দিকে কী কাজে গিয়েছিল, তাকে ফিরে আসতে কেউ দেখেনি।

খোঁজাখুঁজি করতে-করতে ঘাসের বনের বাইরে কটা বালির উপরে সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজন সঙ্গে করে পায়ের দাগ দেখে অনেক দূর গিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলির রক্তাক্ত দেহ বার করলেন। তাঁকে তাঁবুতে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল। কিন্তু সিংহের কোনো চিহ্ন মিলল না। লোকজনের চিৎকারে সে শিকার ফেলে পালিয়েচে। সন্ধ্যার আগেই কুলিটা মারা গেল।

তাঁবুর চারপাশের লম্বা ঘাস অনেক দূর পর্যন্ত কেটে সাফ করে দেওয়া হল পরদিনই। দিন কতক সিংহের কথা ছাড়া তাঁবুতে আর কোনো গল্পই নেই। তারপর মাসখানেক পরে ঘটনাটা পুরনো হয়ে গেল, সে কথা সকলের মনে চাপা পড়ে গেল। কাজকর্ম আবার বেশ চলল।

সেদিন দিনে খুব গরম। সন্ধ্যার একটু পরেই কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ল। কুলিদের তাঁবুর সামনে অনেক কাঠ-কুটো জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েচে। সেখানে তাঁবুর সবাই গোল হয়ে বসে গল্পগুজব করচে। শঙ্করও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প শুনচে এবং অগ্নিকুণ্ডের আলোতে 'কেনিয়া মর্নিং নিউজ' পড়চে। খবরের কাগজখানা পাঁচদিনের পুরনো। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরে তবু এখানাতে বাইরের দুনিয়ার যা কিছু একটা খবর পাওয়া যায়।

তিরুমল আপ্পা বলে একজন মাদ্রাজী কেরানির সঙ্গে শঙ্করের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিরুমল তরুণ যুবক, বেশ ইংরিজি জানে, মনেও খুব উৎসাহ! সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে এ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। শঙ্করের পাশে বসে সে আজ সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দেশের কথা, তার বাপ-মায়ের কথা, তার ছোট বোনের কথা বলছে! ছোট বোনকে সে বড় ভালোবাসে। বাড়ি ছেড়ে এসে তার কথাই তিরুমলের বড় মনে হয়। একবার সে দেশের দিকে যাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। মাস দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব?

ক্রমে রাত বেশি হল। মাঝে-মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, আবার কুলিরা তাতে কাঠ-কুটো ফেলে দিচ্ছে। আরও অনেকে উঠে শুতে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ধীরে-ধীরে দূর দিগন্তে দেখা দিল—সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো-আঁধারের লুকোচুরি আর বুনো গাছের দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া।

শঙ্করের ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই

স্তব্ধ রাত্রির সৌন্দর্য। কুলিদের ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে একদৃষ্টে সম্মুখের বিশাল জনহীন তৃণভূমির আলো-আঁধারমাখা রূপের দিকে চেয়ে-চেয়ে কত কি ভাবছিল। ওই বাওবাব গাছটার ওদিকে অজানা দেশের সীমা কেপটাউন পর্যন্ত বিস্তৃত—মধ্যে পড়বে কত পর্বত, অরণ্য, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগর জিম্বারি—বিশাল ও বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খনির দেশ!

একজন বড় স্বর্ণান্বেষী পর্যটক যেতে-যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন সেটা হাতে তুলে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গে সোনা মেশানো রয়েচে। সে জায়গায় বড় একটা সোনার খনি বেরিয়ে পড়ল। এ ধরনের কত গল্প সে পড়েচে দেশে থাকতে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশ, হীরের দেশ—কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলী, অজানা জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসাব রেখেচে?

কত কি ভাবতে-ভাবতে শঙ্কর কখন ঘুমিয়ে পড়েচে। হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেচে। ধবধবে শাদা জ্যোৎস্না দিনের মতো পরিষ্কার। অগ্নিকুণ্ডের আগুন গিয়েচে নিবে। কুলিরা সব কুণ্ডলি পাকিয়ে আগুনের উপরে শুয়ে আছে। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ শঙ্করের দৃষ্টি পড়ল তার পাশে—এখানে তো তিরুমল আপ্পা বসে-বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল। সে কোথায়? তাহলে হয়তো সে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে থাকবে।

শঙ্করও নিজে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করচে, এমন সময়ে অল্পদূরেই পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জন শুনতে পাওয়া গেল। রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোক যেন কেঁপে উঠল সে রবে। কুলিরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। শঙ্কর জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গর্জন—সেই দিকদিশাহীন তৃণভূমির মধ্যে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সে গর্জন যে কি এক অনির্দেশ্য অনুভূতি তার মনে জাগালে! তা ভয় নয়, সে এক রহস্যময় জটিল মনোভাব। একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলি ছিল তাঁবুতে। সে বললে, সিংহ লোক মেরেচে। লোক না মারলে এমন গর্জন করবে না!

তাঁবুর ভিতর থেকে তিরুমলের সঙ্গী এসে হঠাৎ জানালে তিরুমলের বিছানা শূন্য। তাঁবুর মধ্যে কোথাও সে নেই।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। শঙ্করও নিজে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখে এল সত্যিই সেখানে কেউ নেই। তখনি কুলিরা আলো জ্বেলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সব তাঁবুগুলোতে খোঁজ করা হল, নাম ধরে চিৎকার করে ডাকাডাকি করলে সবাই মিলে—তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না।

তিরুমল যেখানটাতে শুয়ে ছিল, সেখানটাতে ভালো করে

দেখা গেল তখন। কোনো একটা ভারি জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মাটির উপর সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে কারো দেরি হল না। বাওবাব গাছের কাছে তিরুমলের জামার হাতার খানিকটা টুকরো পাওয়া গেল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে আগে-আগে চললেন, শঙ্কর তাঁর সঙ্গে চলল। কুলিরা তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। সেই গভীর রাত্রে তাঁবু থেকে দূরে মাঠের চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হল তিরুমলের দেহের কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার সিংহ গর্জন শোনা গেল, কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জন প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী কোনো রহস্যময়ী রাক্ষসীর বিকট চিৎকার।

মাসাই কুলিটা বললে—সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেক-গুলো মানুষ ও ঘায়েল না করে ছাড়বে না। সবাই সাবধান। যে সিংহ একবার মানুষ খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত ধূর্ত হয়ে ওঠে।

রাত যখন প্রায় তিনটে, তখন সবাই ফিরল তাঁবুতে। বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার এই অংশে পাখি বড় একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের রাত্রিচর পাখির ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে—সে সুর অপার্থিব ধরনের মিষ্টি। এইমাত্র সেই পাখি কোনো গাছের মাথায় বহুদূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্তে উদাস করে দেয়। শঙ্কর ঘুমুতে গেল না। আর সবাই

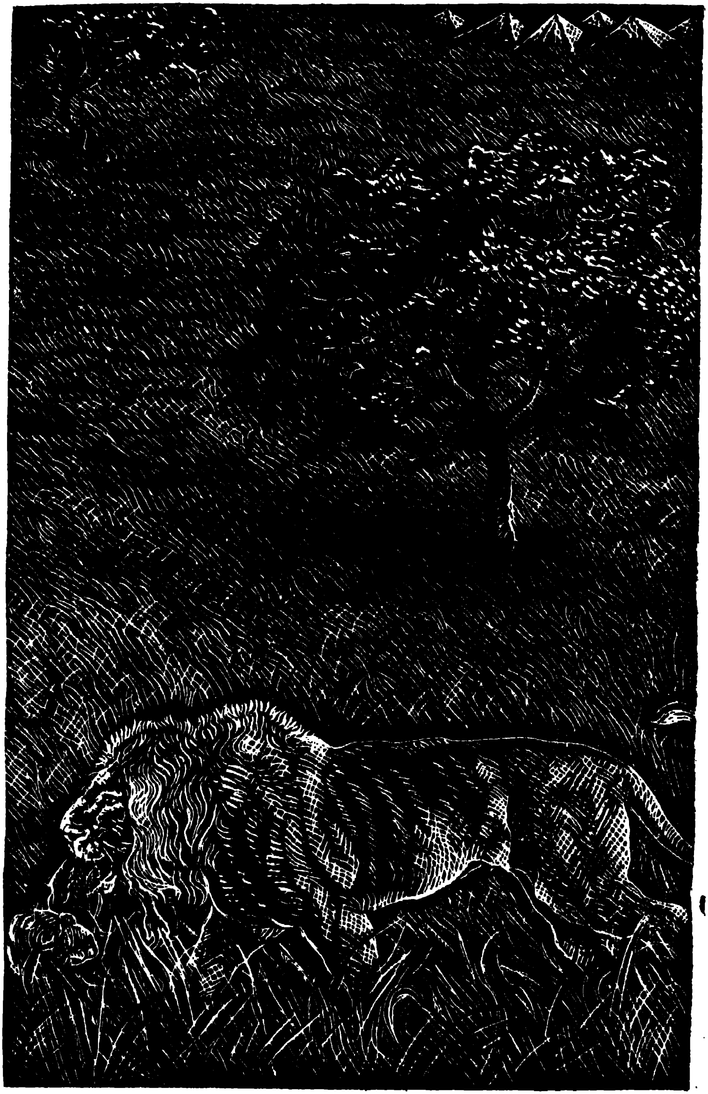
তাঁবুর মধ্যে শুতে গেল কারণ পরিশ্রম কারো কম হয়নি। তাঁবুর সামনে কাঠ-কুটো জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা হল। শঙ্কর সাহস করে বাইরে বসতে অবিশ্যি পারলে না—এ রকম দুঃসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে নিজের খড়ের ঘরে শুয়ে জানলা দিয়ে বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোকিত অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল।

মনে কি এক অদ্ভুত ভাব। তিরুমলের অদৃষ্টলিপি এইজন্যেই বোধ হয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল। তাকেই বা কি জন্যে এখানে এনেচে তার অদৃষ্ট, কে জানে তার খবর ?

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর ! দেখতে বাবলা বনে ভর্তি বাংলাদেশের মাঠের মতো দেখালে কি হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল ! যেখানে-সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা—পর মুহূর্তে কী ঘটবে, এ মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না।

আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেচে—তরুণ হিন্দু যুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।

তিরুমল তো গেল, সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাম্পে পরদিন থেকে এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে আর সেখানে সিংহের উপদ্রবে থাকা যায় না। মানুষ-খেকো সিংহ অতি ভয়ানক জানোয়ার ! যেমন সে ধূর্ত, তেমনি সাহসী। সন্ধ্যা তো দূরের কথা, দিনমানেই একা বেশিদূর যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার আগে তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড়-বড় আগুনের কুণ্ড করা হয়,



কুলিরা আগুনের কাছে ঘেঁষে বসে গল্প করে, রান্না করে, সেখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া করে। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক হাতে রাত্রে তিন-চারবার তাঁবুর চারদিকে ঘুরে পাহারা দেন, ফাঁকা আওয়াজ করেন—এত সতর্কতার মধ্যেও একটা কুলিকে সিংহ নিয়ে পালালো তিরুমলকে মারবার ঠিক দুদিন পরে সন্ধ্যারাত্রে।

তারপর দিন একটা সোমালি কুলি দুপুরে তাঁবু থেকে তিনশো গজের মধ্যে পাথরের ঢিবিতে পাথর ভাঙতে গেল—সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না।

সেই রাত্রেই, রাত দশটার পরে, শঙ্কর এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরচে, লোকজন কেউ বড় একটা বাইরে নেই, সকাল-সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েচে, কেবল এখানে, ওখানে দু-একটা নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকচে—শেয়ালের ডাক শুনলেই শঙ্করের মনে হয় যে, বাঙলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আছে—চোখ বুজে নিজের গ্রামটা ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই বিলিতি আমড়াগাছটা ভাববার চেষ্টা করে—আজও সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুজলে।

কি চমৎকার লাগে! কোথায় সে? সেই তাদের গাঁয়ের বাড়ির জানলার কাছে তক্তপোশে শুয়ে? বিলিতি আমড়া গাছটার ডালপালা চোখ খুলতেই চোখ পড়বে? ঠিক? দেখবে সে চোখ খুলে?

শঙ্কর ধীরে-ধীরে চোখ খুললে।

অন্ধকার প্রান্তর। দূরে সেই বড় বাওবাব গাছটা অস্পষ্ট অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনের একটা ছাতার মতো গোল খড়ের নিচু চালের উপরে কী যেন একটা নড়চে। পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা সিংহ খড়ের চাল থাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করবার চেষ্টা করচে ও মাঝে-মাঝে নাকটা চালের গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে কিসের যেন ঘ্রাণ নিচ্চে!

তার কাছে থেকে চালটার দূরত্ব বড় জোড় বিশ হাত।

শঙ্কর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সিংহ চালার খড় খুঁচিয়ে গর্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে—শঙ্করকে সে এখনো দেখতে পায়নি। তাঁবুর বাইরে কোথাও লোক নেই, সিংহের ভয়ে বেশি রাত্রে কেউ বাইরে থাকে না। নিজে সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, একগাছ লাঠি পর্যন্ত নেই হাতে।

শঙ্কর নিঃশব্দে পিছু হঠতে লাগল এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে, সিংহের দিকে চোখ রেখে। এক মিনিট···তু মিনিট··· নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে তার এত কর্তৃত্ব ছিল, তা এর আগে শঙ্কর জানত না। একটা ভীতিসূচক শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুল না বা সে হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টাও করলে না।

এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখলে সাহেব

টেবিলে বসে তখনো কাজ করচে। সাহেব ওর রকম-সকম দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু জিগগেস করবার আগেই ও বললে—সাহেব, সিংহ।

সাহেব লাফিয়ে উঠল—কৈ? কোথায়?

বন্দুকের র‍্যাকে একটা ·৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফেল ছিল, সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে। শঙ্করকে আর একটা রাইফেল দিলে। দুজনে তাঁবুর পর্দা তুলে আস্তে-আস্তে বাইরে এল। একটু দূরেই কুলি লাইনের সেই গোল চালা। কিন্তু চালার উপর কোথায় সিংহ? শঙ্কর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এই মাত্র দেখে গেলাম স্যার। ঐ চালার উপর সিংহ থাবা দিয়ে খোঁচাচ্চে।

সাহেব বললে—পালিয়েচে। জাগাও সবাইকে।

একটু পরে তাঁবুতে মহা সোরগোল পড়ে গেল। লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুগুর নিয়ে কুলির দল হল্লা করে বেরিয়ে পড়ল, খোঁজ-খোঁজ চারিদিকে, খড়ের চাল সত্যিই ফুটো দেখা গেল। সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সিংহ উধাও হয়েচে। আগুনের কুণ্ডে বেশি করে কাঠ ও শুকনো খড় ফেলে আগুন আবার জ্বালানো হল। সেই রাত্রে অনেকেরই ভালো ঘুম হল না, তাঁবুর বাইরেও বড় একটা কেউ রইল না। শেষ রাত্রের দিকে শঙ্কর নিজের তাঁবুতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—একটা মহা সোরগোলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মাসাই কুলিরা সিম্বা-সিম্বা বলে চিৎকার

করছে। তুবার বন্দুকের আওয়াজ হল। শঙ্কর তাঁবুর বাইরে এসে ব্যাপার জিগগেস করে জানলে সিংহ এসে আস্তাবলের একটা ভারবাহী অশ্বতরকে জখম করে গিয়েচে—এই মাত্র। সবাই শেষ রাত্রে একটু ঝিমিয়ে পড়েচে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোকরা কুলিকে তাঁবু থেকে একশো হাতের মধ্যে সিংহ নিয়ে গেল। দিন চারেক পর আর একটা কুলিকে নিলে বাওবাব গাছটার তলা থেকে।

কুলিরা কেউ আর কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে গাঁতিওয়ালা কুলিদের অনেক সময় খুব ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে হয়—তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বেশিদূর যেতে চায় না। তাঁবুর মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। সকলের মনে ভয়—প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। কাকে কখন নেবে কিছু স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় কাজ হয় না। কেবল মাসাই কুলিরা অবিচলিত রইল—তারা যমকেও ভয় করে না। তাঁবু থেকে তুমাইল দূরে গাঁতির কাজ তারাই করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার তাদের দেখাশুনা করে আসে।

কত নতুন ব্যবস্থা করা হল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব কমল না। কত চেষ্টা করেও সিংহ শিকার করা গেল না। অনেকে বলল সিংহ একটা নয় অনেকগুলো—কটা মেরে ফেলা যাবে? সাহেব বললে—মানুষ-খেকো সিংহ বেশি থাকে না। এ একটা সিংহেরই কাজ।

একদিন সাহেব শঙ্করকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে গাঁতিদার কুলিদের একবার দেখে আসতে। শঙ্কর বললে সাহেব তোমার ম্যানলিকারটা দাও।

সাহেব রাজী হল। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে একটা অশ্বতরে চড়ে রওনা হল—তাঁবু থেকে মাইল খানেক দূরে এক জায়গায় একটা ছোট জলা। শঙ্কর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে পেয়েচে, তখন বেলা প্রায় তিনটে। কেউ কোনো দিকে নেই, রোদের ঝাঁজ মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেচে।

হঠাৎ অশ্বতর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সেটা এগিয়ে যেতে চায় না। শঙ্করের মনে হল জায়গাটার দিকে যেতে অশ্বতরটা ভয় পাচ্চে। একটু পরে পাশের ঝোপে কী যেন একটা নড়ল। কিন্তু সেদিকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেলে না। সে অশ্বতর থেকে নামল। তবুও অশ্বতর নড়তে চায় না।

হঠাৎ শঙ্করের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝোপের মধ্যে সিংহ তার জন্যে ওৎ পেতে বসে নেই তো? অনেক সময়ে এ রকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপ-ঝাপের মধ্যে লুকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অনুসরণ করে। নির্জন স্থানে সুবিধে বুঝে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে। যদি তাই হয়? শঙ্কর অশ্বতর নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনা করলে না। ভাবলে তাঁবুতে ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অশ্বতরের মুখটা ফিরিয়েছে এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কি একটা নড়ল। সঙ্গে-

সঙ্গে ভয়ানক সিংহ গর্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিরাট দেহ সশব্দে অশ্বতরের উপর এসে পড়ল। শঙ্কর তখন হাত চারেক এগিয়ে আছে, সে তখুনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে উপরি-উপরি দুবার গুলি করলে। গুলি লেগেছে কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তখন অশ্বতর মাটিতে লুটিয়ে পড়েচে—ধূসর বর্ণের জানোয়ারটা পলাতক। শঙ্কর পরীক্ষা করে দেখলে অশ্বতরের কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস ছিন্ন-ভিন্ন, রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সে ছটফট করচে। শঙ্কর এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলে। তারপর সে তাঁবুতে ফিরে এল।

সাহেব বললে সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। বন্দুকের গুলি যদি গায়ে লাগে তবে দস্তুরমতো জখম তাকে হতেই হবে। কিন্তু গুলি লেগেছিল তো? শঙ্কর বললে গুলি লাগালাগির কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছুঁড়েছিল এইমাত্র কথা। লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে দু-তিনদিনেও কোনো আহত বা মৃত সিংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। কতকটা সিংহের উপদ্রবের জন্যে, কতকটা বা জলাভূমির সান্নিধ্যের জন্যে জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

শঙ্করকে আর কনস্ট্রাকসন তাঁবুতে থাকতে হল না। কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট স্টেশনে সে স্টেশন-মাস্টারের কাজ পেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই চলে গেল।

॥ তিন ॥

নতুন পদ পেয়ে উৎফুল্ল মনে শঙ্কর যখন স্টেশনটাতে এসে নামল, তখন বেলা তিনটে হবে। স্টেশনঘরটা খুব ছোট। মাটির প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম আর স্টেশনঘরের আশপাশ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্টেশনঘরের পিছনে তার থাকবার কোয়ার্টার; পায়রার খোপের মতো ছোট। যে ট্রেনখানা তাকে বহন করে এনেছিল, সেখানা কিসুমুর দিকে চলে গেল। শঙ্কর যেন অকূল সমুদ্রে পড়ল। এত নির্জন স্থান সে জীবনে কখনো কল্পনা করেনি।

এই স্টেশনে সে-ই একমাত্র কর্মচারী। একটা কুলি পর্যন্ত নেই। সে-ই কুলি, সে-ই পয়েণ্টসম্যান, সে-ই সব।

এ রকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে, এসব স্টেশন এখনো মোটেই আয়কর নয়। এর অস্তিত্ব এখনো পরীক্ষা-সাপেক্ষ। এদের পিছনে রেল-কোম্পানি বেশি খরচ করতে রাজী নয়। একখানি ট্রেন সকালে, একখানি এই গেল—আর সারা দিন-রাত্রে ট্রেন নেই।

সুতরাং তার হাতে প্রচুর অবসর আছে। চার্জ বুঝে নিতে হবে এই একটু কাজ। আগের স্টেশনমাস্টারটি গুজরাটি, বেশ ইংরিজি জানে। সে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এল। চার্জ বোঝাবার বেশি কিছু নেই। গুজরাটি ভদ্রলোক তাকে পেয়ে

খুব খুশি। ভাবে বোধ হল সে কথা বলবার সঙ্গী পায়নি অনেকদিন। দুজনে প্ল্যাটফর্মে এদিক-ওদিক পায়চারি করলে

শঙ্কর বললে—কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন?

গুজরাটি ভদ্রলোকটি বললে—ও কিছু নয়। নির্জন জায়গা—তাই।

শঙ্করের মনে হল কি একটা কথা লোকটা গোপন করে গেল। শঙ্করও আর পীড়াপীড়ি করলে না। রাত্রে ভদ্রলোক রুটি গড়ে শঙ্করকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে। খেতে বসে হঠাৎ লোকটি চেঁচিয়ে উঠল—ঐ যাঃ, ভুলে গিয়েছি।

—কি হল?

—খাবার জল নেই মোটে, ট্রেন থেকে নিতে একদম ভুলে গিয়েছি।

—সে কি? এখানে জল কোথাও পাওয়া যায় না?

—কোথাও না! একটা কুয়ো আছে, তার জল বেজায় তেতো আর কষা। সে জলে বাসন মাজা ছাড়া আর কোনো কাজ হয় না। খাবার জল ট্রেন থেকে দিয়ে যায়।

বেশ জায়গা বটে। খাবার জল নেই, মানুষজন নেই। এখানে স্টেশন করেছে কেন শঙ্কর বুঝতে পারল না।

পরদিন সকালে ভূতপূর্ব স্টেশনমাস্টার চলে গেল। শঙ্কর পড়ল একা। নিজের কাজ করে, রাঁধে খায়, ট্রেনের সময় প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ায়। দুপুরে বই পড়ে কি বড় টেবিলটাতে

শুয়ে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে।

স্টেশনের চারধার ঘিরে ধূ ধূ সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ ঘাসের বন, মাঝে ইউকা, বাবলা গাছ—দূরে পাহাড়ের সারি, সারা চক্রবাল জুড়ে। ভারি সুন্দর দৃশ্য।

গুজরাটি লোকটি ওকে বারণ করে গিয়েছিল—একা যেন এই সব মাঠে সে না বেড়াতে বার হয়।

শঙ্কর বলেছিল—কেন?

সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গুজরাটি ভদ্রলোকটির কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার উত্তর অন্য দিক থেকে সে রাত্রেই মিলল।

রাত বেশি না হতেই আহারাদি সেরে শঙ্কর স্টেশনঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে ডায়েরি লিখছে—স্টেশনঘরেই সে শোবে। সামনের কাচ-বসানো দরজাটি বন্ধ আছে কিন্তু আগল দেওয়া নেই, কিসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে দেখে দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগিয়ে প্রকাণ্ড সিংহ! শঙ্কর কাঠের মতো বসে রইল। দরজা একটু জোর করে ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। টেবিলের ওপর কেবল কাঠের রুলটা মাত্র আছে।

সিংহটা কিন্তু কৌতুকের সঙ্গে শঙ্কর ও টেবিলের কেরোসিন বাতিটার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খুব বেশিক্ষণ ছিল না, হয়তো মিনিট দুই, কিন্তু শঙ্করের মনে হল সে আর

সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সিংহ ধীরে-ধীরে অনাসক্ত ভাবে দরজা থেকে সরে গেল। শঙ্কর হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিলে।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে স্টেশনের চারিদিকে কাঁটা-তারের বেড়া কেন। কিন্তু শঙ্কর একটু ভুল করেছিল—সে আংশিক ভাবে বুঝেছিল মাত্র, বাকি উত্তরটা পেতে দু-একদিন বিলম্ব ছিল।

সেটা এল অন্য দিক থেকে।

পরদিন সকালের ট্রেনের গার্ডকে সে রাত্রের ঘটনা বলল। গার্ড লোকটি ভালো, সব শুনে বললে—এসব অঞ্চলে সর্বত্রই এমন অবস্থা। এখান থেকে বারো মাইল দূরে তোমার মতো আর একটা ছোট স্টেশন আছে—সেখানেও এই দশা। এখানে তো যে কাণ্ড—

সে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কথা বন্ধ করে ট্রেনে উঠে পড়ল। যাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে বলে গেল—বেশ সাবধানে থেক সর্বদা!

শঙ্কর নিশ্চিত হয়ে পড়ল, এরা কী কথাটা চাপা দিতে চায়? সিংহ ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি? যাহোক, সেদিন থেকে শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে স্টেশনঘরের সামনে রোজ আগুন জ্বালিয়ে রাখে। সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে স্টেশনঘরে ঢোকে—অনেক রাত পর্যন্ত বসে পড়াশুনো করে বা ডায়েরি লেখে।

রত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, প্ল্যাটফর্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্যে দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে-প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক-একদিন গভীর রাতে দূরে কোথায় সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়—অদ্ভুত জীবন।

ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল। এ তার রক্তে আছে। এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা—এই তো জীবন। নিরাপদ শান্ত জীবন নিরীহ কেরানির হতে পারে—তার নয়।

সেদিন বিকেলের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সে নিজের কোয়ার্টারের রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় খুঁটির গায়ে কী একটা দেখে সে তিন হাত লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল—প্রকাণ্ড একটা হলদে খড়িশ গোখুরা তাকে দেখে ফণা উদ্যত করে খুঁটি থেকে প্রায় এক হাত বাইরে মুখ বাড়িয়েছে! আর দু সেকেণ্ড পরে যদি শঙ্করের চোখ সেদিকে পড়ত—তাহলে—না, এখন সাপটাকে মারবার কি করা যায়? কিন্তু সাপটা পরমুহূর্তে খুঁটি বেয়ে উপরে খড়ের চালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বেশ কাণ্ড বটে! ঐ ঘরে গিয়ে শঙ্করকে এখন ভাত রাঁধতে বসতে হবে। এ সিংহ নয় যে দরজা বন্ধ করে আগুন জেলে রাখবে। খানিকটা ইতস্তত করে শঙ্কর অগত্যা রান্নাঘরে ঢুকল এবং কোনোরকমে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে সন্ধ্যা হবার আগেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে স্টেশনঘরে

এল। কিন্তু স্টেশনঘরেই বা বিশ্বাস কি? সাপ কখন কোন ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকবে, তাকে কি আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

পরদিন সকালের ট্রেনে গার্ডের গাড়ি থেকে একটা নতুন কুলি তার রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল। সপ্তাতে দুদিন মোম্বাসা থেকে চাল আর আলু রেল-কোম্পানী এই সব নির্জন স্টেশনের কর্মচারীদের পাঠিয়ে দেয়—মাসিক বেতন থেকে এর দাম কেটে নেওয়া হয়।

যে কুলিটা রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল সে ভারতীয়, গুজরাট অঞ্চলে বাড়ি। বস্তাটা নামিয়ে সে কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে চাইল শঙ্করের দিকে, এবং পাছে শঙ্কর তাকে কিছু জিগগেস করে, এই ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ল।

কুলির সে দৃষ্টি শঙ্করের চোখ এড়ায়নি। কী রহস্য জড়িত আছে যেন এই জায়গাটার সঙ্গে, কেউ তা ওর কাছে প্রকাশ করতে চায় না। প্রকাশ করা যেন বারণ আছে। ব্যাপার কী?

দিন দুই পরে ট্রেন পাশ করে সে নিজের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে—আর একটু হলে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিল আর কি! সেই খরিশ গোখুরা সাপ। পূর্বদৃষ্ট সাপটাও হতে পারে, নতুন একটা যে নয় তারও কোনো প্রমাণ নেই।

শঙ্কর সেই দিন স্টেশনঘর, নিজের কোয়ার্টার ও চারধারের জমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলে। সারা জায়গা মাটিতে বড়-বড় গর্ত, কোয়ার্টারের উঠোনে, রান্নাঘরের দেয়ালে, কাঁচা

প্ল্যাটফর্মের মাঝে-মাঝে সর্বত্র গর্ত ও ফাটল আর ইঁদুরের মাটি। তবুও সে কিছু বুঝতে পারলে না।

একদিন সে স্টেশনঘরে ঘুমিয়ে আছে, রাত অনেক। ঘর অন্ধকার, হঠাৎ শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর একটা কোনো ইন্দ্রিয় যেন মুহূর্তের জন্যে জাগরিত হয়ে উঠে তাকে জানিয়ে দিলে যে সে ভয়ানক বিপদে পড়বে। ঘোর অন্ধকার, শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। টর্চটা হাতড়ে পাওয়া যায় না কেন? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ টর্চটা তার হাতে ঠেকল, এবং কলের পুতুলের মতো সে সামনের দিকে ঘুরিয়ে টর্চটা জ্বাললে।

সঙ্গে-সঙ্গেই সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে টর্চটা ধরে বিছানার উপরেই বসে রইল।

দেয়াল ও তার বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় মাথা উঁচু করে তুলে ও টর্চের আলো পড়ার দরুন সাময়িক ভাবে আলো-আঁধারি লেগে থ-খেয়ে আছে আফ্রিকার ক্রূর ও হিংস্রতম সাপ—কালো মাম্বা! ঘরের মেঝে থেকে সাপটা প্রায় আড়াই হাত উঁচু হয়ে উঠেছে—সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয় যখন ব্ল্যাক মাম্বা সাধারণত মানুষকে তাড়া করে তার ঘাড়ে ছোবল মারে। ব্ল্যাক মাম্বার হাত থেকে রেহাই পাওয়া এক রকম পুনর্জন্ম তাও শঙ্কর শুনেছে!

শঙ্করের একটা গুণ বাল্যকালে থেকেই আছে, বিপদে তার

সহজে বুদ্ধিভ্রংশ হয় না—আর তার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর সে ঘোর বিপদেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

শঙ্কর বুঝলে হাত যদি তার একটু কেঁপে যায়—তবে যে মুহূর্তে সাপটার চোখ থেকে আলো সরে যাবে—সেই মুহূর্তে ওর আলো-আঁধারি কেটে যাবে এবং তখুনি সে করবে আক্রমণ।

সে বুঝলে তার আয়ু নির্ভর করচে এখন দৃঢ় ও অকম্পিত হাতে টর্চটা সাপের চোখের দিকে ধরে থাকার উপর। যতক্ষণ সে এ রকম ধরে রাখতে পারবে ততক্ষণ সে নিরাপদ। কিন্তু যদি টর্চটা একটু এদিক ওদিক সরে যায়?

শঙ্কর টর্চ ধরেই রইল। সাপের চোখ দুটো জ্বলচে যেন দুটো আলোর দানার মতো। কি ভীষণ শক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্চে চাবুকের মতো খাড়া উদ্যত তার কালো, মিশমিশে, সরু দেহটাতে।

শঙ্কর ভুলে গেছে চারপাশের সব আসবাব-পত্র, আফ্রিকা দেশটা, তার রেলের চাকরি, মোম্বাসা থেকে কিসুমু লাইনটা, তার দেশ, তার বাবা-মা—সমস্ত জগৎটা শূন্য হয়ে গিয়ে সামনের ওই দুটো জ্বল্-জ্বলে আলোর দানায় পরিণত হয়েচে, তার বাইরে শূন্য! অন্ধকার! মৃত্যুর মতো শূন্য, প্রলয়ের পরের বিশ্বের মতো অন্ধকার।

সত্য কেবল ওই মহাহিংস্র উদ্যত-ফণা মাম্বা, যেটা প্রত্যেক ছোবলে ১৫০০ মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং দেবার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে।



শঙ্করের হাত ঝিমঝিম করছে, আঙুল অবশ হয়ে আসচে, কনুই থেকে বগল পর্যন্ত হাতের যেন সাড় নেই। কতক্ষণ সে আর টর্চ ধরে থাকবে? আলোর দানা দুটো হয়তো সাপের চোখ নয়—জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র—কিংবা—

টর্চের ব্যাটারির তেজ কমে আসচে না? শাদা আলো যেন হলদে ও নিস্তেজ হয়ে আসচে না? কিন্তু জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র দুটো তেমনি জ্বলচে। রাত না দিন? ভোর হবে না সন্ধ্যা হবে?

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিলে। ওই চোখ দুটোর জ্বালাময়ী দৃষ্টি তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলচে। সে সজাগ থাকবে। এ তেপান্তরের মাঠে চেঁচালেও কেউ কোথাও নেই সে জানে, তার নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর দৃঢ়তার উপর নির্ভর করচে তার জীবন। কিন্তু সে পারচে না যে, হাত যেন টনটন করে অবশ হয়ে আসচে, আর কতক্ষণ সে টর্চ ধরে থাকবে? সাপে না হয় ছোবল দিক কিন্তু হাতখানা একটু নামিয়ে সে আরাম বোধ করবে এখন।

তারপরেই ঘড়িতে টং-টং করে তিনটে বাজলো। ঠিক রাত তিনটে পর্যন্তই বোধ হয় শঙ্করের আয়ু ছিল, কারণ তিনটে বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠে নড়ে গেল—সামনের আলোর দানা দুটো গেল নিভে। কিন্তু সাপ কই? তাড়া করে এল না কেন?

পরক্ষণেই শঙ্কর বুঝতে পারলে সাপটাও সাময়িক মোহগ্রস্ত

হয়েচে তার মতো। এই অবসর! বিদ্যুতের চেয়েও বেগে সে টেবিল থেকে একলাফ মেরে অন্ধকারের মধ্যে দরজার আগল খুলে ফেলে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

সকালের ট্রেন এল। শঙ্কর বাকি রাতটা প্ল্যাটফর্মেই কাটিয়েছে। ট্রেনের গার্ডকে বললে সব ব্যাপার। গার্ড বললে, চলো দেখি স্টেশনঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে কোথাও সাপের চিহ্নও পাওয়া গেল না। গার্ড লোকটা ভালো, বললে—বলি তবে শোনো। খুব বেঁচে গিয়েচ কাল রাত্রে। এতদিন কথাটা তোমায় বলিনি, পাছে ভয় পাও। তোমার আগে যিনি স্টেশনমাস্টার এখানে ছিলেন—তিনিও সাপের উপদ্রবেই এখান থেকে পালান। তাঁর আগে দুজন স্টেশনমাস্টার এই স্টেশনের কোয়ার্টারে সাপের কামড়ে মরেচে। আফ্রিকার ব্ল্যাক মাম্বা যেখানে থাকে, তার ত্রিসীমানায় লোক আসে না। বন্ধুভাবে কথাটা বললাম, উপরওয়ালাদের বলো না যেন যে আমার কাছ থেকে এ কথা শুনেছ। ট্রান্সফারের দরখাস্ত কর।

শঙ্কর বললে—দরখাস্তের উত্তর আসতেও তো দেরি হবে, তুমি একটা উপকার কর। আমি এখানে একেবারে নিরস্ত্র, আমাকে একটা বন্দুক কি রিভলবার যাবার পথে দিয়ে যেও। আর কিছু কার্বলিক এ্যাসিড। ফিরবার পথেই কার্বলিক এ্যাসিডটা আমাকে দিয়ে যেও।

ট্রেন থেকে সে একটা কুলিকে নামিয়ে নিলে এবং দুজনে

মিলে সারাদিন সর্বত্র গর্ত বুজিয়ে বেড়ালে। পরীক্ষা করে দেখে মনে হল কাল রাত্রে স্টেশনঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের কোণে একটা গর্ত থেকে সাপটা বেরিয়ে ছিল। গর্তগুলো ইঁদুরের, বাইরের সাপ দিনমানে ইঁদুর খাবার লোভে গর্তে ঢুকেছিল হয়তো। গর্তটা বেশ ভালো করে বুজিয়ে দিলে। ডাউন-ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে এক বোতল কার্বলিক এ্যাসিড পাওয়া গেল—ঘরের সর্বত্র ও আশে-পাশে সে অ্যাসিড ছড়িয়ে দিলে। কুলিটা তাকে একটা বড় লাঠি দিয়ে গেল। দু-তিনদিনের মধ্যেই রেল কোম্পানি থেকে ওকে একটা বন্দুক দিলে।

॥ চার ॥

স্টেশনে জলের বড়ই কষ্ট। ট্রেন থেকে যে জল দেয়, তাতে রান্না-খাওয়া কোনো রকমে চলে স্নান আর হয় না। এখানকার কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েছে। একদিন সে শুনল স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জলাশয় আছে সেখানে ভালো জল পাওয়া যায় মাছও আছে।

স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে একদিন সে সকালের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সেখানে মাছ ধরতে চলল—সঙ্গে একজন সোমালি কুলি, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম মোম্বাসা থেকে আনিয়ে নিয়ে ছিল। জলাশয়টা মাঝারি গোছের,

চারধারে উঁচু ঘাসের বন, ইউকা গাছ, কাছেই একটা অনুচ্চ পাহাড়। জলে সে স্নান সেরে উঠে ঘণ্টা দুই ছিপ ফেলে ট্যাংরা জাতীয় ছোট-ছোট মাছ অনেকগুলি পেলে। মাছ অদৃষ্টে জোটেনি অনেকদিন কিন্তু আর বেশি দেরি করা চলবে না কারণ আবার বিকেল চারটের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছনো চাই, বিকেলের ট্রেন পাশ করাবার জন্যে।

মাঝে-মাঝে প্রায়ই সে মাছ ধরতে যায়। কোনোদিন সঙ্গে লোক থাকে—প্রায়ই একা যায়। স্নানের কষ্টও ঘুচেছে।

গ্রীষ্মকাল ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম—বেলা নটার পর থেকে আর রোদে যাওয়া যায় না। এগারোটার পর থেকে শঙ্করের মনে হয় যেন দিকবিদিক দাউ-দাউ করে জ্বলচে। তবুও সে ট্রেনের লোকের মুখে শুনলে মধ্য-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার গরমের কাছে এ নাকি কিছুই নয়।

শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে শঙ্করের জীবনের গতি মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে গেল। একদিন সকালের দিকে শঙ্কর মাছ ধরতে গিয়েছিল। যখন ফিরচে তখন বেলা তিনটে। স্টেশন যখন আর মাইলটাক আছে, তখন শঙ্করের কানে গেল সেই রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে কে যেন কোথায় অস্ফুট আর্তস্বরে কী বলচে! কোনদিক থেকে স্বরটা আসচে, লক্ষ্য করে কিছুদূর যেতেই দেখলে একটা ইউকাগাছের নিচে স্বল্প মাত্র ছায়াটুকুতে কে একজন বসে আছে।



শঙ্কর দ্রুতপদে তার কছে গেল। লোকটা ইউরোপিয়ান, পরনে তালি দেওয়া ছিন্ন ও মলিন কোটপ্যাণ্ট। একমুখ লাল দাড়ি, বড়-বড় চোখ, মুখের গড়ন বেশ সুশ্রী, দেহও বেশ বলিষ্ঠ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সম্ভবত রোগে, কষ্টে ও অনাহারে বর্তমানে শীর্ণ। লোকটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে অবসন্ন ভাবে পড়ে আছে। তার মাথায় মলিন সোলার টুপিটা একদিকে গড়িয়ে পড়েচে মাথা থেকে—পাশে একটা খাকি কাপড়ের বড় ঝোলা।

শঙ্কর ইংরিজিতে জিগগেস করলে—তুমি কোথা থেকে আসচো?

লোকটা কথার উত্তর না দিয়ে মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে জলপানের ভঙ্গি করে বললে—একটু জল! জল!

শঙ্কর বললে—এখানে তো জল নেই। আমার উপর ভর দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত আসতে পারবে?

অতি কষ্টে খানিকটা ভর দিয়ে, এবং শেষের দিকে এক রকম শঙ্করের কাঁধে চেপে লোকটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল। ওকে আনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল, বিকেলের ট্রেন ওর অনুপস্থিতিতেই চলে গিয়েছে। ও লোকটাকে স্টেশনঘরে বিছানা পেতে শোয়ালে, জল খাইয়ে সুস্থ করলে, কিছু খাদ্যও এনে দিলে। সে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শঙ্কর দেখলে লোকটার ভারি জ্বর হয়েচে। অনেক দিনের অনিয়মে, পরিশ্রমে, অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েচে—ছ-চারদিনে সে সুস্থ হবে না।

লোকটা একটু পরে পরিচয় দিলে। তার নাম ডিয়েগো আলভারেজ—জাতে পর্টুগীজ, তবে আফ্রিকার সূর্য তার বর্ণ তামাটে করে দিয়েচে।

রাত্রে ওকে স্টেশনে রাখলে শঙ্কর। কিন্তু ওর অসুখ দেখে সে পড়ে গেল বিপদে—এখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই—সকালের ট্রেন মোম্বাসার দিকে যায় না, বিকেলের ট্রেনে গার্ড রোগীকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাত কাটতে এখনো অনেক দেরি। বিকেলের গাড়িখানা স্টেশনে এসে যদি পাওয়া যেত, তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

শঙ্কর রোগীর পাশে রাত জেগে বসে রইল। লোকটির শরীরে কিছু নেই। খুব সম্ভবত কষ্ট ও অনাহার ওর অসুখের কারণ। দূর বিদেশে ওর কেউ নেই—শঙ্কর না দেখলে ওকে দেখবে কে?

বাল্যকাল থেকেই পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে, শঙ্কর যে-ভাবে সারা রাত তার সেবা করলে, তার কোনো আপনার লোক ওর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত না।

উত্তর-পূর্ব কোণের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর পিছন থেকে চাঁদ উঠছে যখন সে রাত্রে, ঝমঝম করচে নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, তখন হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে ভীষণ সিংহ-গর্জন শোনা গেল। রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল—সিংহের ডাকে সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। শঙ্কর বললে—ভয় নেই, শুয়ে থাকো। বাইরে সিংহ ডাকচে, দরজা বন্ধ আছে।

তারপর শঙ্কর আস্তে-আস্তে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে চারধারে চেয়ে দেখবামাত্রই যেন সে রাত্রির অপূর্ব দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে ফেলল। চাঁদ উঠচে দূরের আকাশপ্রান্তে—ইউকা গাছের লম্বা-লম্বা ছায়া পড়েচে পুব থেকে পশ্চিমে, ঘাসের বন যেন রহস্যময়, নিস্পন্দ। সিংহ ডাকচে স্টেশনের কোয়ার্টারের পিছনে প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে। কিন্তু সিংহের ডাক আজকাল শঙ্করের গা-সওয়া হয়ে উঠেছে—ওতে আর আগের মতো ভয় পায় না। রাত্রির সৌন্দর্য এত আকৃষ্ট করেচে ওকে যে ও সিংহের সান্নিধ্য যেন ভুলে গেল।

ফিরে ও স্টেশনঘরে ঢুকল। টং-টং করে ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। ও ঘরে ঢুকে দেখলে রোগী বিছানায় উঠেই বসে আছে। বললে—একটু জল দাও, খাব।

লোকটা বেশ ভালো ইংরিজি বলতে পারে। শঙ্কর টিন থেকে জল নিয়ে ওকে খাওয়ালে।

লোকটার জ্বর তখন যেন কমেচে। সে বললে—তুমি কি বলছিলে ? আমার ভয় করচে ভাবছিলে ? ডিয়েগো আলভারেজ, ভয় করবে ? ইয়্যাং ম্যান, তুমি ডিয়েগো আলভারেজকে জানো না। লোকটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ মেশানো অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিল। সে অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ঢলে পড়ল। ওই হাসিতে শঙ্করের মনে হল এ লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে

নজর পড়ল শঙ্করের। বেঁটে-বেঁটে মোটা-মোটা আঙুল—দড়ির মতো শিরাবহুল হাত, তাম্রাভ দাড়ির নিচে চিবুকের ভাব শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এতক্ষণ পরে খানিকটা জ্বর কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসচে যেন ধীরে-ধীরে।

লোকটা বললে—সরে এসো কাছে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেচ। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশি করতে পারত না। তবে একটা কথা বলি—আমি বাঁচব না। আমার মন বলচে আমার দিন ফুরিয়ে এসেচে। তোমার উপকার করে যেতে চাই। তুমি ইণ্ডিয়ান? এখানে কত মাইনে পাও? এই সামান্য মাইনের জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূর এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর আজ তোমাকে যে সব কথা বলব—আমার মৃত্যুর পূর্বে তুমি কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না?

শঙ্কর সেই আশ্বাসই দিলে। তারপরই সেই অদ্ভুত রাত্রি ক্রমশঃ কেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে এমন এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ধরনের আশ্চর্য কাহিনী শুনে গেল—যা সাধারণত উপন্যাসেই পড়া যায়।

ডিয়েগো আলভারেজের কথা

ইয়্যাং ম্যান, তোমার বয়স কত হবে? বাইশ? তুমি, যখন মায়ের কোলে শিশু—আজ বাইশ বছর আগের কথা, ১৮৮৮-৮৯ সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনির সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়েস ছিল কম, দুনিয়ার কোনো বিপদকেই বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না।

বুলাওয়ে শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে একাই রওনা হলাম, সঙ্গে কেবল দুটি গাধা, জিনিসপত্র বইবার জন্যে। জাম্বেজি নদী পার হয়ে চলেচি, পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, শুধু ছোটো-খাটো পাহাড়, ঘাস, মাঝে-মাঝে কাফিরদের বস্তি। ক্রমে যেন মানুষের বাস কমে এল, এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছানো গেল, যেখানে এর আগে কখনো কোনো ইউরোপিয়ান আসেনি।

যেখানেই নদী বা খাল দেখি—কিংবা পাহাড় দেখি—সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি। লোকে কত কি পেয়ে বড়মানুষ হয়ে গিয়েচে দক্ষিণ-আফ্রিকায়, এ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে কত কাহিনীই শুনে এসেছিলুম—সেই সব গল্পের মোহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলেছিল। কিন্তু বৃথাই দু-বছর ধরে নানস্থানে ঘুরে বেড়লুম। কত অসহ্য কষ্ট

সহ্য করলুম এই দু-বছরে। একবার তো সন্ধান পেয়েও হারালুম।

সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিকে। তাঁবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুয়ে পড়লুম দুপুরবেলা, কারণ দুপুরের রোদে পথ চলা সেসব জায়গায় একরকম অসম্ভব, ১১৫ ডিগ্রি থেকে ১৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে। বিশ্রামের পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি বন্দুকের নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েচে। মাছি না থাকলে রাইফেলের তাগ ঠিক হয় না। এদিক-ওদিক কত খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না। কাছেই একটা পাথরের ঢিবি, তার গায়ে শাদা-শাদা কি একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল। ঢিবি-টার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে। বেছে-বেছে তারই একটি দানা সংগ্রহ করে ঘষে-মেজে নিয়ে আপাতত সেটাকেই মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম। তারপর বিকেলে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখে রওনা হয়েচি, কোথায় তাঁবু ফেলেছিলাম, সে কথা ক্রমেই ভুলে গিয়েছি।

দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেও আমার মতো সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে দুজন মাটাবেল কুলি ছিল। পরস্পরকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম, তার নাম জিম কার্টার, আমারই মতো ভবঘুরে, তবে তার বয়েস আমার চেয়ে বেশি। জিম একদিন আমার বন্দুকটা

নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমায় বললে—বন্দুকের মাছি তোমার এ রকম কেন? তারপর আমার গল্প শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে—তুমি বুঝতে পারনি এ জিনিসটা খাঁটি রুপো, খনিজ রুপো। এ যেখানে পাওয়া যায়, সাধারণত সেখানে রুপোর খনি থাকে। আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর থেকে সেখানে অন্তত ন-হাজার আউন্স রুপো পাওয়া যাবে। সে জায়গাতে এক্ষুনি চলো আমরা যাই। এবার আমরা লক্ষপতি হয়ে যাব।

সংক্ষেপে বলি। তারপর কার্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে আবার এলাম। কিন্তু চার মাস ধরে কত চেষ্টা করে, কত অসহ্য কষ্ট পেয়ে, কতবার বিরাট দিকদিশাহীন মরুভূমিবৎ ভেল্ডের মধ্যে পথ হারিয়ে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছেও, কিছুতেই আমি সে স্থান নির্ণয় করতে পারলাম না। যখন সেখান থেকে সেবার তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছিলাম, অত লক্ষ্য করিনি জায়গাটা! আফ্রিকার ভেল্ডে কোনো চিহ্ন বড় একটা থাকে না, যার সাহায্যে পুরনো জায়গা খুঁজে বার করা যায়—সবই যেন একরকম। অনেকবার হয়রান হয়ে শেষে আমরা রুপোর খনির আশা ত্যাগ করে গুয়াই নদীর দিকে চললাম। জিম কার্টার আমাকে আর ছাড়লে না, তার মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিল। তার সে শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবলে এখনো আমার কষ্ট হয়।

তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সব চেয়ে বেশি বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। তাই এখন থেকে আমরা নদীপথ ধরে চলব, এই স্থির করা গেল। বনের জন্তু শিকার করে খাই আর মাঝে-মাঝে কাফির বস্তি যদি পাই, সেখান থেকে মিষ্টি আলু, মুরগি প্রভৃতি সংগ্রহ করি।

একবার অরেঞ্জ নদী পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটা কাফির বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছি, সেইদিন দুপুরের পরে কাফির বস্তির একটি মোড়লের মেয়ে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা দেখতে গেলাম—পাঁচ-ছ-বছরের একটা ছোট্ট উলঙ্গ মেয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে—তার পেটে নাকি ভয়ানক ব্যথা। সবাই কাঁদচে ও দাপাদাপি করচে। মেয়েটার ঘাড়ে নিশ্চয়ই দানো চেপেচে—ওকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না। তাকে ও তার বাপ-মাকে জিগগেস করে এইটুকু জানা গেল, সে বনের ধারে গিয়েছিল—তারপর থেকে তাকে ভূতে পেয়েচে।

আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বনের ফল বেশি পরিমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্চে। তাকে জিগগেস করা হল, কোনো বনের ফল সে খেয়েছিল কিনা? সে বললে হ্যাঁ, খেয়েছিল। কাঁচা ফল? মেয়েটা বললে—ফল নয়, ফলের বীজ। সে ফলের বীজই খাদ্য।

একডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল। গ্রামে আমাদের খাতির



হয়ে গেল খুব। পনেরো দিন আমরা সে গ্রামের সর্দারের অতিথি হয়ে রইলাম। ইলাণ্ড হরিণ শিকার করি আর রাত্রে কাফিরদের মাংস খেতে নিমন্ত্রণ করি। বিদায় নেবার সময় কাফির সর্দার বললে—তোমরা শাদা পাথর খুব ভালোবাসো, না? বেশ খেলবার জিনিস। নেবে শাদা পাথর? দাঁড়াও দেখাচ্চি। একটু পরে সে একটা ডুমুর ফলের মতো বড় শাদা পাথর আমাদের হাতে এনে দিলে। জিম ও আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম—জিনিসটা হীরে! খনি বা খনির উপরকার পাথরে মৃত্তিকাস্তর থেকে পাওয়া পালিশ-না-করা হীরের টুকরো!

কাফির সর্দার বললে—এটা তোমরা নিয়ে যাও। ঐ যে দূরের বড় পাহাড় দেখচো, ধোঁয়া-ধোঁয়া—এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁচে যাবে। ঐ পাহাড়ের মধ্যে এ রকম শাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনেচি। আমরা কখনো যাইনি, জায়গা ভালো নয়, ওখানে বুনিপ বলে উপদেবতা থাকে। অনেক চাঁদ আগেকার কথা, আমাদের গ্রামের তিনজন সাহসী লোক কারো বারণ না শুনে ঐ পাহাড়ে গিয়েছিল, আর ফেরেনি! আর একবার একজন তোমাদের মতো শাদা মানুষ এসেছিল, সেও অনেক, অনেক চাঁদ আগে। আমরা দেখিনি, আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা। সে গিয়েও আর ফেরেনি।

কাফির গ্রাম থেকে বার হয়েই পথে আমরা ম্যাপ মিলিয়ে

দেখলাম—দূরের ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে রিখ-টারসভেল্ড পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণ-আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা বন্য, অজ্ঞাত, বিশাল ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চল। দু-একজন দুর্ধর্ষ দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া, কোনো সভ্য মানুষ সে অঞ্চলে পদার্পণ করেনি। ঐ বিস্তীর্ণ বনপর্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কি আছে কেউ বলতে পারে না।

জিম কার্টার ও আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, আমরা দুজনেই তখনি স্থির করলাম ওই অরণ্য ও পর্বতমালা আমাদেরই আগমন প্রতিক্ষায় তার বিপুল রত্নভাণ্ডার লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন করে রেখেচে, ওখানে আমরা যাবোই।

কাফির গ্রাম থেকে রওনা হবার প্রায় সতেরো দিন পরে আমরা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে নিবিড় বনে প্রবেশ করলাম।

আগেই বলেচি দক্ষিণ-আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে এই পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। জঙ্গলের কাছাকাছি কোনো কাফির বস্তি পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না। জঙ্গল দেখে মনে হল কাঠুরিয়ার কুঠার আজ পর্যন্ত এখানে প্রবেশ করেনি।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছে-ছিলাম। জিম কার্টারের পরামর্শ মতো সেইখানেই আমরা রাত্রের বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটালাম। জিম জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে, আমি লাগলাম রান্নার কাজে। সকালের দিকে একজোড়া পাখি মেরেছিলাম, সেই পাখি ছাড়িয়ে তার রোস্ট

করব এই ছিল মতলব। পাখি ছাড়ানোর কাজে একটু ব্যস্ত আছি, এমন সময় জিম বললে—পাখি রাখো। দু-পেয়ালা কফি করো তো আগে।

আগুন জ্বালাই ছিল। জল গরম করতে দিয়ে আবার পাখি ছাড়াতে বসেছি এমন সময় সিংহের গর্জন একেবারে অতি নিকটে শোনা গেল। জিম বন্দুক নিয়ে বেরুল, আমি বললাম অন্ধকার হয়ে আসচে, বেশি দূর যেও না। তারপরে আমি পাখি ছাড়াচ্চি, কিছু দূরে জঙ্গলের বাইরেই দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম। একটুখানি থেমে আবার আর একটা আওয়াজ। তারপরেই সব চুপ। মিনিট দশ কেটে গেল, জিম আসে না দেখে আমি নিজের রাইফেলটা নিয়ে যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেদিকে একটু যেতেই দেখি জিম আসচে, পিছনে কি একটা ভারি মতো টেনে আনচে। আমায় দেখে বললে—ভারি চমৎকার ছালখানা। জঙ্গলের ধারে ফেলে রাখলে হায়নাতে সাবাড় করে দেবে। তাঁবুর কাছে টেনে নিয়ে যাই চল! দুজনে টেনে সিংহের প্রকাণ্ড দেহটা তাঁবুর আগুনের কাছে নিয়ে এসে ফেললাম। তারপর ক্রমে রাত হল। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে সিংহের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবু থেকে অল্প দূরেই সিংহ ডাকচে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক কতদূরে। আমি রাইফেল নিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম।

জিম শুধু একবার বললে—সন্ধ্যাবেলার সেই সিংহটার জুড়ি।

বলেই সে নির্বিকারভাবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দেখি আগুন নিবে গিয়েচে। পাশে কাঠকুঠো ছিল, তাই দিয়ে আবার জোর আগুন জ্বাললাম। তারপর আবার এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিছু দূরে গিয়ে কয়েকজন কাফিরের সঙ্গে দেখা হল। তারা হরিণ শিকার করতে এসেচে। আমরা তাদের তামাকের লোভ দেখিয়ে কুলি ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিতে চাইলাম।

তারা বললে—তোমরা জানো না তাই ও কথা বলচ। এ জঙ্গলে মানুষ আসে না। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। ঐ পাহাড়ের শ্রেণী অপেক্ষাকৃত নিচু, ওটা পার হয়ে মধ্যে খানিকটা সমতল জায়গা আছে, ঘন বনে ঘেরা, তার ওদিকে আবার এর চেয়েও উঁচু পর্বতশ্রেণী। ঐ বনের মধ্যে সমতল জায়গাটা বড় বিপজ্জনক, ওখানে বুনিপ থাকে। বুনিপের হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না। ওখানে কেউ যায় না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাব মরতে? ভালো চাও তো তোমরাও যেও না।

আমরা জিগগেস করলাম—বুনিপ কী?

তারা জানে না। তবে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে বুনিপ কী

না জানলেও, সে কি অনিষ্ট করতে পারে সেটা তারা খুব ভালো রকমই জানে।

ভয় আমাদের ধাতে ছিল না, জিম কার্টারের তো একেবারেই না। সে আরোও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল। এই বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে—হীরে পাই বা না পাই। মৃত্যু যে তাকে অলক্ষিতে টানচে তখনও যদি বুঝতে পারতাম!

বৃদ্ধ এই পর্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্করের মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে, এ ধরনের কথা সে কখনো আর শোনেনি। মুমূর্ষু ডিয়েগো আলভারেজের জীর্ণ পরিচ্ছদ ও শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে, তার পাকা ভুরু জোড়ার নিচেকার ইস্পাতের মতো নীল দীপ্তিশীল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় ভরে উঠল।

সত্যিকার মানুষ বটে একজন!

আলভারেজ বললে—আর এক গ্লাস জল।

জল পান করে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলে—

হ্যাঁ, তারপরে শোনো। ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। কত বড়-বড় গাছ, বড়-বড় ফার্ন, কত বিচিত্র বর্ণের অর্কিড্ ও লায়ানা, স্থানে-স্থানে সে বড় নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য, বড়-বড় গাছের নিচেকার জঙ্গল এতই ঘন। বঁড়শির মতো কাঁটাগাছের গায়ে, মাথার উপরকার পাতায়-পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্যের আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গলে প্রবেশ

করে কিনা সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। অত্যন্ত বেবুনের উৎপাত জঙ্গলের সর্বত্র, বড় গাছের ডালে দলে-দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানা রকমের বেবুন বসে আছে—অনেক সময় দেখলাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্য করে না। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়—তু-একটা বুড়ো সর্দার বেবুন সত্যিই হিংস্র প্রকৃতির, হাতে বন্দুক না থাকলে তারা অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ করত। জিম কার্টার বললে—অন্তত আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না কখনো এ জঙ্গলে।

সাত, আটদিন সেই নিবিড় জঙ্গলে কাটল। জিম কার্টার ঠিকই বলেছিল, প্রতিদিন একটা করে বেবুন আমাদের খাদ্য যোগান দিতে দেহপাত করত। উঁচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলের নানাস্থানে ছোট-বড় ঝরনা নেমে এসেচে, সুতরাং জলের অভাবও ঘটল না। একবার কিন্তু এতে বিপদও ঘটেছিল। একটা ঝরনার ধারে তুপুরবেলা এসে আগুন জ্বেলে বেবুনের দাপনা ঝলসাবার ব্যবস্থা করচি, জিম গিয়ে তৃষ্ণার ঝোঁকে ঝরনার জল পান করলে। তার একটু পরেই তার ক্রমাগত বমি হতে শুরু করল। পেটে ভয়ানক ব্যথা। আমি একটা বিজ্ঞান জানতাম, আমার সন্দেহ হওয়াতে ঝরনার জল পরীক্ষা করে দেখি, জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে। উপর পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে ঝরনা নেমে আসচে নিশ্চয়ই। হোমিওপ্যাথিক বাক্স থেকে প্রতিষেধক ওষুধ দিতে সন্ধ্যার দিকে জিম সুস্থ হয়ে উঠল।

বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে-মাঝে দু-একটা বিষধর সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্যজন্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি। পাখির কথা আর প্রজাপতির কথা অবশ্য বাদ দিলাম। কারণ এই সব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া এত বিচিত্র বর্ণের ও শ্রেণীর পাখি ও প্রজাপতি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বন্যজন্তু বলতে যা বোঝায়, তারা সে পর্যায়ে পড়ে না।

প্রথমেই রিখটারসভেল্ড পর্বতশ্রেণীর একটা শাখা পর্বত আমাদের সামনে পড়ল, সেটা মূল ও প্রধান পর্বতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিচু। সেটা পার হয়ে আমরা একটা বিস্তীর্ণ বনময় উপত্যকায় নেবে তাঁবু ফেললাম। একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েচে। নদী দেখে আমার ও জিমের আনন্দ হল, এই সব নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খনিজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

নদীর নানাদিকে আমরা বালি পরীক্ষা করে বেড়াই, কিছুই কোথাও পাওয়া যায় না। সোনার একটা রেণু পর্যন্ত নেই নদীর বালিতে। আমরা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লুম। তখন প্রায় কুড়ি-বাইশদিন কেটে গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় কফি খেতে-খেতে জিম বললে—দেখ, আমার মন বলচে এখানে আমরা সোনার সন্ধান পাব। থাক এখানে আর কিছুদিন। আরও কুড়িদিন কাটল। বেবুনের মাংস অসহ্য ও অত্যন্ত অরুচিকর হয়ে উঠেচে। জিমের মতো লোকও হতাশ হয়ে পড়ল।

আমি বললাম—আর কেন জিম, চল ফিরি এবার। কাফির গ্রামে আমাদের ঠকিয়েচে। এখানে কিছু নেই।

জিম বললে—এই পর্বতশ্রেণীর নানা শাখা আছে, সবগুলো না দেখে যাবো না।

একদিন পাহাড়ী নদীটার খাতের ধারে বসে বালি চালতে চালতে পাথরের নুড়ির রাশির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত একখানা হলদে রঙের ছোট পাথর আমি ও জিম একসঙ্গেই দেখতে পেলাম। দুজনেই তাড়াতাড়ি সেটা খুঁড়ে তুললাম। আমাদের মুখ আনন্দে ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিম বললে—ডিয়েগো, পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হল, চিনেচ তো?

আমিও বুঝেছিলাম। বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু নদীস্রোতে ভেসে আসা জিনিসটা। খনির অস্তিত্ব নেই এখানে।

পাথরখানা দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হলদে রঙের হীরের জাত। অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কারণ ছিল না, কারণ এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে, এই বিশাল পর্বতশ্রেণীর কোনো অজ্ঞাত, দুর্গম অঞ্চলে হলদে হীরের খনি আছে। নদীস্রোতে ভেসে এসেছে তা থেকে একটা স্তরের একটা টুকরো। সে মূল খনি খুঁজে বার করা অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য ও সাহস সাপেক্ষ।

সে পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্যের অভাব আমাদের ঘটত না, কিন্তু যে দৈত্য ঐ রহস্যময় বনপর্বতের অমূল্য হীরকখনির প্রহরী, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বাধা দিলে।

একদিন আমরা বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম করচি, আমাদের সামনে সেই জায়গাটাতে একটা তালগাছ, তালগাছের তলায় গুঁড়িটা ঘিরে খুব ঘন বন-ঝোপ। হঠাৎ আমরা দেখলাম কিসে যেন অতবড় তাল-গাছটা এমন নাড়া দিচ্ছে যে, তার উপরকার শুকনো ডাল-পালাগুলো খড়-খড় করে নড়ে উঠছে, যেমন নড়ে ঝড় লাগলে। গাছটাও সেই সঙ্গে নড়চে।

আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাতাস নেই কোনোদিকে, অথচ তালগাছটা নড়চে কেন? আমাদের মনে হল কে যেন তালগাছের গুঁড়িটা ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। জিম তখনই ব্যাপারটা কী তা দেখতে গুঁড়ির-তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলো।

সে ওর মধ্যে ঢুকবার অল্পক্ষণ পরেই আমি একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল নিয়ে ছুটে গেলুম। ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি জিম রক্তাক্ত দেহে বনের মধ্যে পড়ে আছে, কোনো ভীষণ বলবান জন্তুতে তার মুখের সামনে থেকে বুক পর্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফেঁড়ে দিয়েছে—যেমন পুরনো বালিশ ফেঁড়ে তুলো বার করে তেমনি।

জিম শুধু বললে—সাক্ষাৎ শয়তান! মূর্তিমান শয়তান—হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললে—পালাও পালাও—

তারপরেই জিম মারা গেল। তালগাছের গায়ে দেখি যেন কিসের মোটা শক্ত চোঁচ লেগে আছে। আমার মনে হল কোনো ভীষণ বলবান জানোয়ার তালগাছের গায়ে গা ঘষছিল,

গাছটা ওরকম নড়ছিল সেই জন্যেই। জন্তুটার কোনো পাত্তা পেলাম না। জিমের দেহ ফাঁকা জায়গায় বার করে আমি রাইফেল হাতে ঝোপের ওপারে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মাটির উপরে কোনো অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন, তার মোটে তিনটে আঙুল পায়ে। কিছুদূর গেলাম পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে, জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে একটা গুহার মুখে পদচিহ্নটা ঢুকে গেল। গুহার প্রবেশ পথের কাছে শুকনো বালির উপর ওই অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার বড়-বড় তিন আঙুলে থাবার দাগ রয়েচে।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেচে। সেই জনহীন অরণ্যভূমি ও পর্বতবেষ্টিত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আমি এক অজ্ঞাততর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করচি। ডাইনে চেয়ে দেখি প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সুউচ্চ ব্যাসাল্টের দেওয়াল খাড়া উঠেচে প্রায় চার হাজার ফুট, বনে-বনে নিবিড়, খুব উঁচুতে পর্বতের বাঁশবনের মাথায় সামান্য যেন একটু রাঙা রোদ—কিংবা হয়তো আমার চোখের ভুল, অনন্ত আকাশের আভা পড়ে থাকবে।

ভাবলাম, এ সময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না। জিমের দেহ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। সারারাত তার মৃতদেহ নিয়ে আগুন জ্বেলে রাইফেল তৈরি রেখে বসে রইলুম।

পরদিন জিমকে সমাধিস্থ করে আবার ওই জানোয়ারটার

খোঁজে বার হলাম। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, সে গুহা অনেক খুঁজেও কিছুতেই বার করতে পারলুম না। ওরকম অনেক গুহা আছে পর্বতের নানা জায়গায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন গুহা দেখেছিলাম কে জানে?

সঙ্গীহীন অবস্থায় সেই মহাদুর্গম রিখটারসভেল্ড পর্বতশ্রেণীর বনের মধ্যে থাকা চলে না। পনেরো দিন হেঁটে সেই কাফির বস্তিতে পৌঁছলাম। তারা চিনতে পারলে, খুব খাতির করলে। তাদের কাছে জিমের মৃত্যুকাহিনী বললাম।

শুনে তাদের মুখ ভয়ে কেমন হয়ে গেল, ছোট-ছোট চোখ ভয়ে বড় হয়ে উঠল। বললে—সর্বনাশ! বুনিপ। ওই ভয়েই ওখানে কেউ যায় না।

কাফির বস্তি থেকে আর পাঁচদিন হেঁটে অরেঞ্জ নদীর ধারে এসে একখানা ডাচ লঞ্চ পেলাম। তাতে করে এসে সভ্য জগতে পৌঁছলাম।

আমি আর কখনও রিখটারসভেল্ড পর্বতের দিকে যেতে পারিনি। চেষ্টা করেছিলাম অনেক। কিন্তু বুয়র যুদ্ধ এসে পড়ল। যুদ্ধে গেলাম। আহত হয়ে প্রিটোরিয়ার হাসপাতালে অনেক দিন রইলাম। তারপর সেরে উঠে একটা কমলালেবুর বাগানে কাজ পেয়ে সেখানেই এতদিন ছিলাম।

বছর চার-পাঁচ শান্ত জীবন যাপন করবার পরে, ভালো লাগল না, তাই আবার বার হয়েছিলাম। বয়েস হয়ে গিয়েছে অনেক, ইয়্যাং ম্যান, এবার আমার চলা বোধ হয় ফুরুবে।

এই ম্যাপখানা তুমি রাখ। এতে রিখটারসভেল্ড পর্বত ও যে নদীতে আমরা হীরে পেয়েছিলাম, মোটামুটি ভাবে আঁকা আছে। সাহস থাকে. সেখানে যেও, বড়মানুষ হবে। বুয়র যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু-একটা ছোট-বড় হীরের খনি বেরিয়েছে কিন্তু আমরা যেখানে হীরে পেয়েছিলুম তার সন্ধান কেউ জানে না। যেও তুমি।

ডিয়েগো আলভারেজ গল্প শেষ করে আবার অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার গুণে ডিয়েগো আলভারেজ সে যাত্রা সেরে উঠল এবং দিন পনেরো শঙ্কর তাকে নিজের কাছেই রাখলে। কিন্তু চিরকাল যে পথে-পথে বেড়িয়ে এসেচে, ঘরে তার মন বসে না। একদিন সে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শঙ্কর নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল। বললে—চল, তোমার অসুখের সময় যে সব কথা বলেছিলে, মনে আছে? সেই হলদে হীরের খনি?

অসুখের ঝোঁকে আলভারেজ যে সব কথা বলেছিল, এখন সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ আর কোনো কথাটি বলে না। বেশির ভাগ সময় চুপ করে কী যেন ভাবে। শঙ্করের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বললে—

আমিও কথাটা যে না ভেবে দেখেচি, তা মনে কোরো না। কিন্তু আলেয়ার পিছনে ছুটবার সাহস আছে তোমার ?

শঙ্কর বললে—আছে কি না তা দেখতে দোষ কি ? আজই বল তো মাভো স্টেশনে তার করে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলি।

আলভারেজ কিছুক্ষণ ভেবে বললে—কর তার। কিন্তু আগে বুঝে দেখ। যারা সোনা বা হীরে খুঁজে বেড়ায় তারা সব সময় তা পায় না। আমি আশি বছরের এক বুড়ো লোককে জানতাম, সে কখনো কিছু পায়নি। তবে প্রতিবারই বলতো, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি, এইবার পাব। আজীবন অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্ডে প্রসপেকটিং করে বেড়িয়েছে।

আরও দিন দশেক পরে দুজনে কিসুমু গিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদে ষ্টীমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ানজার দিকে যাবে ঠিক করলে।

পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাজার-হাজার জেব্রা জিরাফ, হরিণ চরতে দেখে শঙ্কর তো অবাক। এমন দৃশ্য সে আর কখনো দেখেনি।

জিরাফগুলো মানুষকে আদৌ ভয় করে না, পঞ্চাশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল।

আলভারেজ বললে—আফ্রিকার জিরাফ মারবার জন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। যে-সে

মারতে পারে না। সেইজন্য মানুষকে ওদের তত ভয় নেই।

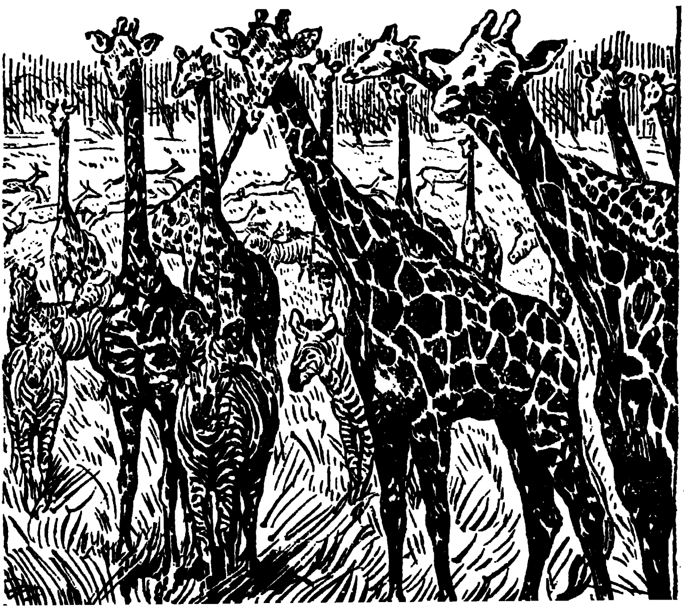
হরিণের দল কিন্তু বড় ভীরু, এক-এক দলে দু-তিনশো হরিণ চরচে। ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে একবার চাইলে, পরক্ষণেই মাঠের দূর প্রান্তের দিকে সবাই চার পা তুলে দৌড়।

কিস্মুমু থেকে ষ্টীমার ছাড়ল—এটা ব্রিটিশ ষ্টীমার, ওদের পয়সা কম বলে ডেকে যাচ্ছে। নিগ্রো মেয়েরা পিঠে ছেলেমেয়ে



বেঁধে মুরগী নিয়ে ষ্টীমারে উঠেছে। মাসাই কুলিরা ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে, সঙ্গে নাইরোবি শহর থেকে কাঁচের পুঁতি, কম দামের খেলো আয়না ছুরি প্রভৃতি নানা জিনিস।

ষ্টীমার থেকে নেমে আবার ওরা পথ চলে। ভিক্টোরিয়া হ্রদের যে বন্দরে ওরা নামল, তার নাম মোয়ানজা। এখান থেকে তিনশো মাইল দূরে ট্যাবোরা, সেখানে পৌঁছে কয়েক দিন বিশ্রাম করে ওরা যাবে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের তীরবর্তী উজিজি বন্দরে।



এই পথে যাবার সময় আলভারেজ বললে টাঙ্গানিয়াকার মধ্য দিয়ে যাওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। এখানে একরকম মাছি আছে তা কামড়ালে স্লিপিং সিকনেস হয়। স্লিপিং সিকনেস-এর মড়কে টাঙ্গানিয়াকা জনশূন্য হয়ে পড়েচে। মোয়ানজা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের ভয়ও খুব বেশি। প্রকৃত পক্ষে আফ্রিকার এই অঞ্চলও সিংহের রাজ্য বলা চলে।

শহর থেকে দশ মাইল দূরে পথের ধারে একটা ছোট খড়ের বাংলো। সেখানে এক ইউরোপীয় শিকারী আশ্রয় নিয়েচে। আলভারেজকে সে খুব খাতির করলে। শঙ্করকে দেখে বললে—একে পেলে কোথায়? এ তো হিন্দু। তোমার কুলি?

আলভারেজ বললে—আমার ছেলে।

সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললে—কি রকম?

আলভারেজ আনুপূর্বিক সব বর্ণনা করলে, তার রোগের কথা, শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার কথা। কেবল বললে না কোথায় যাচ্চে ও কী উদ্দেশ্যে যাচ্চে।

সাহেব হেসে বললে—বেশ ভালো। ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর মনে সাহস ও দয়া দুই-ই আছে। ইস্ট ইণ্ডিজের হিন্দুরা লোক হিসেবে ভালোই বটে। একবার ইউগাণ্ডাতে একজন শিখ আমার প্রতি এমন সুন্দর আতিথ্য দেখিয়েছিল, তা কখনও ভুলতে পারব না। আজ তোমরা এস, রাত সামনে, আমার এখানেই রাত্রি যাপন কর। এটা গবর্ণমেণ্টের ডাকবাংলো,

আমিও তোমাদের মতো সারাদিন পথ চলে বিকেলের দিকে এসে উঠেচি।

সাহেবের একটি ছোট গ্রামোফোন ছিল, সন্ধ্যার পরে টিনবন্দী বিলিতি টোমাটোর ঝোল ও সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করার পরে সবাই বাংলোর বাইরে ক্যাম্প চেয়ারে শুয়ে রেকর্ডের পর রেকর্ড শুনে যাচ্চে, এমন সময় অল্প দূরে সিংহের গর্জন শোনা গেল। বোধ হল মাটির কাছে মুখ নামিয়ে সিংহ গর্জন করচে—কারণ মাটি যেন কেঁপে-কেঁপে উঠচে।

সাহেব বললে—টাঙ্গানিয়াকায় বেজায় সিংহের উপদ্রব আর বড় হিংস্র এরা। প্রায় অধিকাংশ সিংহই মানুষখেকো। মানুষের রক্তের আস্বাদ একবার পেয়েচে, এখন মানুষ ছাড়া আর কিছু চায় না।

শঙ্কর ভাবলে খুব সুসংবাদ বটে। ইউগাণ্ডা রেলওয়ে তৈরি হবার সময় সে সিংহের উপদ্রব, কাকে বলে খুব ভালো করেই দেখেচে।

পরদিন সকালে ওরা আবার রওনা হল। সাহেব বলে দিলে সূর্য উঠে গেলে খুব সাবধানে থাকবে। স্লিপিং সিকনেস-এর মাছি রোদ উঠলেই জাগে, গায়ে যেন না বসে।

দীর্ঘ-দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে শুঁড়িপথ। আলভারেজ বললে—খুব সাবধান, এই সব ঘাসের বনেই সিংহের আড্ডা; বেশি পিছনে থেক না।

আলভারেজের বন্দুক আছে, এই একটা ভরসা। আর একটা ভরসা এই যে আলভারেজ, যাকে বলে 'ক্র্যাকশট' তাই। অর্থাৎ তার গুলি বড় একটা ফসকায় না। কিন্তু অত বড় অব্যর্থ-লক্ষ্য শিকারী সঙ্গে থেকেও শঙ্কর বিশেষ ভরসা পেলে না, কারণ ইউগাণ্ডার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, সিংহ যখন যাকে নেবে, এমন সম্পূর্ণ অতর্কিতেই নেবে যে, পিঠের রাইফেলের চামড়ার স্ট্র্যাপ খুলবার অবকাশ পর্যন্ত দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যা হবার ঘণ্টাখানেক আগে দূরবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রাত্রের বিশ্রামের জন্যে স্থান নির্বাচন করে নিতে হল। আলভারেজ বললে—সামনে কোনো গ্রাম নেই। অন্ধকারের পর এখানে পথ চলা ঠিক নয়।

একটা সুবৃহৎ বাওবাব গাছের তলায় দু-টুকরো কেম্বিস্ ঝুলিয়ে ছোট্ট একটু তাঁবু খাটানো হল। কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রের খাবার তৈরি করতে বসল শঙ্কর। তারপর সমস্ত-দিন পরিশ্রমের পরে দুজনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে আলভারেজ ডাকলে—শঙ্কর, ওঠ।

শঙ্কর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

আলভারেজ বললে—কী একটা জানোয়ার তাঁবুর চারপাশে ঘুরচে, বন্দুক বাগিয়ে রাখ।

সত্যিই একটা কোনো অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ তাঁবুর পাতলা কেম্বিসের পর্দার বাইরে শোনো যাচ্ছে বটে। তাঁবুর সামনে সন্ধ্যায় যে আগুন করা হয়েছিল, তার স্বল্পাবশিষ্ট আলোকে

সুবৃহৎ বাওবাব গাছটা একটা ভীষণদর্শন দৈত্যের মতো দেখাচ্চে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে বৃদ্ধ বারণ করলে।

পরক্ষণেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে তাঁবুটা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুর পরদার ভিতর থেকেই আলভারেজ পর-পর দুবার রাইফেল ছুঁড়লে। শব্দটা লক্ষ্য করে শঙ্করও সেই মুহূর্তে বন্দুক ওঠালে। কিন্তু শঙ্কর ঘোড়া টিপবার আগে আলভারেজের রাইফেল আর একবার আওয়াজ করে উঠল। তারপরেই সব চুপ।

ওরা টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দেখলে তাঁবুর পুবদিকে বাইরের পর্দাটা খানিকটা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ।

সেটা তখনো মরেনি, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছে। আরও দুবার গুলি খেয়ে সেটা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আলভারেজ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বললে—রাত এখনো অনেক। ওটা এখানে পড়ে থাক। চলো আমরা আমাদের ঘুম শেষ করি।

দুজনেই এসে শুয়ে পড়ল—একটু পরে শঙ্কর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আলভারেজের নাসিকা গর্জন শুরু হয়েচে। শঙ্করের চোখে ঘুম এল না।

আধঘণ্টা পরে শঙ্করের মনে হল, আলভারেজের নাসিকা গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে টাঙ্গানিয়াকা অঞ্চলের সমস্ত সিংহ

যেন এক যোগে ডেকে উঠল। সে কি ভয়ানক সিংহের ডাক! আগেও শঙ্কর অনেকবার সিংহ গর্জন শুনেচে, কিন্তু এ রাত্রের সে ভীষণ বিরাট গর্জন তার চিরকাল মনে ছিল। তা ছাড়া ডাক তাঁবু থেকে বিশ হাতের মধ্যে।

আলভারেজ আবার জেগে উঠল। বললে—নাঃ, রাত্রে দেখচি একটু ঘুমুতে দিলে না। আগের সিংহটার জোড়া। সাবধান থাক। বড় পাজি জানোয়ার।

কি দুর্যোগের রাত্রি! তাঁবুর আগুনও তখন নিবু-নিবু। তাই বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাতলা কেম্বিসের চটের মাত্র ব্যবধান—তার ওদিকে সাথীহারা পশু। বিরাট গর্জন করতে-করতে সেটা একবার তাঁবু থেকে দূরে যায়, আবার কাছে আসে, কখনো তাঁবু প্রদক্ষিণ করে।

ভোর হবার কিছু আগে সিংহটা সরে পড়ল। ওরাও তাঁবু তুলে আবার যাত্রা শুরু করলে।

॥ ছয় ॥

দিন পনেরো পরে শঙ্কর ও আলভারেজ উজিজি বন্দর থেকে ষ্টীমারে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদে ভাসল। হ্রদ পার হয়ে আলবার্টভিল বলে একটা ছোট শহরে কিছু আবশ্যকীয় জিনিস কিনে নিল। এই শহর থেকে কাবালো পর্যন্ত বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্টের রেলপথ আছে। সেখান থেকে কঙ্গোনদীতে ষ্টীমার চড়ে তিনদিনের

পথ সানকিনি যেতে হবে, সানকিনিতে নেমে কঙ্গোনদীর পথ ছেড়ে, দক্ষিণ মুখে অজ্ঞাত বনজঙ্গল ও মরুভূমির দেশে প্রবেশ করতে হবে।

কাবালো অতি অপরিষ্কার স্থান, কতকগুলো বর্ণসঙ্কর পর্টুগিজ ও বেলজিয়ানের আড্ডা।

স্টেশনের বাইরে পা দিয়েচে এমন সময় একজন পর্টুগিজ ওর কাছে এসে বললে—হ্যালো, কোথায় যাবে? দেখচি নতুন লোক, আমায় চেনো না নিশ্চয়ই। আমার নাম আলবুকার্ক।

শঙ্কর চেয়ে দেখলে আলভারেজ তখনো স্টেশনের মধ্যে।

লোকটার চেহারা যেমন কর্কশ, তেমনি কদাকার। কিন্তু সে ভীষণ জোয়ান, প্রায় সাতফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের প্রত্যেকটি মাংসপেশী গুণে নেওয়া যায়, এমন সুদৃঢ় ও সুগঠিত।

শঙ্কর বললে—তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।

লোকটা বললে—তুমি দেখচি কালা আদমি, বোধহয় ইস্ট ইণ্ডিজের। আমার সঙ্গে পোকার খেলবে চল।

শঙ্কর ওর কথা শুনে চটেছিল, বললে—তোমার সঙ্গে পোকার খেলবার আমার আগ্রহ নেই। সঙ্গে-সঙ্গে সে এটাও বুঝলে, লোকটা পোকার খেলবার ছলে তার সর্বস্ব অপহরণ করতে চায়। পোকার একরকম তাশের জুয়াখেলা, শঙ্কর নাম জানলেও সে খেলা জীবনে কখনো দেখেওনি, নাইরোবিতে সে জানত বদমাইস জুয়াড়িরা পোকার খেলার ছল করে নতুন লোকের সর্বনাশ করে। এটা এক ধরনের ডাকাতি।

শঙ্করের উত্তর শুনে পর্টুগিজ বদমাইসটা রেগে লাল হয়ে উঠল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে চাইল। সে আরও কাছে ঘেঁষে এসে, দাঁতে দাঁত চেপে, অতি বিকৃত সুরে বললে—কী? নিগার, কী বললি? ইস্ট ইণ্ডিজের তুলনায় তুই অত্যন্ত ফাজিল দেখচি। তোর ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যে তোকে জানিয়ে দিই যে, তোর মতো কালা আদমিকে অলবুকার্ক এই রিভলবারের গুলিতে কাঁদাখোঁচা পাখির মতো ডজনে-ডজনে মেরেচে। আমার নিয়ম হচ্চে এই শোন্। কাবালোতে যারা নতুন লোক নামবে, তারা হয় আমার সঙ্গে পোকার খেলবে, নয়তো আমার সঙ্গে রিভলবারে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে।

শঙ্কর দেখলে এই বদমাইস লোকটার সঙ্গে রিভলবারের লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অনিবার্য। বদমাইসটা হচ্ছে একজন ক্র্যাকশট গুণ্ডা, আর সে কি? কাল পর্যন্ত রেলের নিরীহ কেরানী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করে যদি পোকারই খেলে তবে সর্বস্ব যাবে।

হয়তো আধমিনিট কাল শঙ্করের দেরি হয়েচে উত্তর দিতে, লোকটা কোমরের চামড়ার হোলস্টার থেকে নিমেষের মধ্যে রিভলবার বার করে শঙ্করের পেটের কাছে উঁচিয়ে বললে—যুদ্ধ না পোকার?

শঙ্করের মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভীতুর মতো সে পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নিচু করবে না, হোক মৃত্যু।

সে বলতে যাচ্চে—যুদ্ধ, এমন সময় পিছন থেকে ভয়ানক

রাজখাঁই সুরে কে বললে—এই, সামলাও। গুলিতে মাথার চাঁদি উড়ল।

দুইজনেই চমকে উঠে পিছনে চাইলে। আলভারেজ তার উইনচেস্টার রিপিটারটা বাগিয়ে, উঁচিয়ে, পর্টুগিজ বদমাইসটার মাথা লক্ষ্য করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। শঙ্কর সুযোগ বুঝে চট করে পিস্তলের নলের উল্টোদিকে ঘুরে গেল। আলভারেজ বললে—বালকের সঙ্গে রিভলবার ডুয়েল? ছোঃ, তিন বলতে পিস্তল ফেলে দিবি, এক—দুই—তিন—আলবুকার্কের শিথিল হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল।

আলভারেজ বললে—বালককে একা পেয়ে খুব বীরত্ব জাহির করছিলি, না? শঙ্কর ততক্ষণে পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েচে। আলবুকার্ক একটু বিস্মিত হল, আলভারেজ যে শঙ্করের দলের লোক, তা সে ভাবেওনি। সে হেসে বললে—আচ্ছা, মেট, কিছু মনে কোরো না, আমারই হার। দাও, আমার পিস্তল দাও ছোকরা। কোনো ভয় নেই, দাও। এসো হাতে হাত দাও। তুমিও মেট। আলবুকার্ক রাগ পুষে রাখে না। এসো, কাছেই আমার কেবিন, এক-এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে যাও।

আলভারেজ নিজের জাতের লোকের রক্ত চেনে। ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে আলবুকার্কের কেবিনে গেল। শঙ্কর বিয়ার খায় না শুনে তাকে কফি করে দিলে। প্রাণ খোলা হাসি হেসে কত গল্প করলে, যেন কিছুই হয়নি।

শঙ্কর বাস্তবিকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণ আগের অপমান ও শত্রুতা যে এমন বেমালুম ভুলে গিয়ে, যাদের হাতে অপমানিত হয়েচে, তাদেরই সঙ্গে এমনি ধারা দিলখোলা হেসে খোশগল্প করতে পারে, পৃথিবীতে এ ধরনের লোক বেশি নেই।

পরদিন ওরা কাবালো থেকে স্টীমারে উঠল কঙ্গোনদী বেয়ে দক্ষিণ মুখে যাবার জন্যে। নদীর দুই তীরের দৃশ্যে শঙ্করের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এ রকম অদ্ভুত বনজঙ্গলের দৃশ্য জীবনে কখনো সে দেখেনি। এতদিন সে যেখানে ছিল, আফ্রিকার সে অঞ্চলে এমন বন নেই, সে শুধু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রধানত ঘাসের বন, মাঝে-মাঝে বাবলা ও ইউকা গাছ। কিন্তু কঙ্গোনদী বেয়ে স্টীমার যত অগ্রসর হয়, দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা-মোটা লতা, বনের ফুল। বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, আপনার সৌন্দর্য ও নিবিড় প্রাচুর্যে আপনি মুগ্ধ।

শঙ্করের মধ্যে যে সৌন্দর্যপ্রিয় ভাবুক মনটি ছিল, (হাজার হোক সে বাঙলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আলভারেজের মতো শুধু কঠিন প্রাণ স্বর্ণান্বেষী প্রসপেক্টর নয়) এই রূপের মেলায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে, রাঙা অপরাহ্নে ও দুপুর রোদে আপন মনে কত কি স্বপ্নজাল রচনা করে।

অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, অচেনা তারাভরা বিদেশের আকাশের তলায় রহস্যময়ী বন্য প্রকৃতি তখন যেন

জেগে উঠেচে—জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্যজন্তুর ডাক কানে আসে। শঙ্করের চোখে ঘুম নেই, এই সৌন্দর্যস্বপ্নে বিভোর হয়ে, মধ্য-আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও জেগে বসে থাকে।

ঐ জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল—আকাশের অনেকদূরে তার ছোট্ট গ্রামের মাথায়ও আজ এমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেচে, ঐ রকম একফালি কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রির চাঁদও। সেসব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে এসে সে পড়েচে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কী এর পরিণতি কে জানে।

দুদিন পরে বোট এসে সানকিনি পৌঁছুল। সেখান থেকে ওরা আবার পদব্রজে রওনা হল। জঙ্গল এদিকে বেশি নেই, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী জনমানবহীন প্রান্তর ও অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, অধিকাংশ পাহাড় রুক্ষ ও বৃক্ষশূন্য, কোনো-কোনো পাহাড়ে ইউফোর্বিয়া জাতীয় গাছের ঝোপ। কিন্তু শঙ্করের মনে হল, আফ্রিকার এই অঞ্চলের দৃশ্য বড় অপরূপ। এতটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে মন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সূর্যাস্তের রঙ, জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া, এই দেশকে রাত্রে অপরাহ্নে রূপকথার পরীরাজ্য করে তোলে।

আলভারেজ বললে—এই ভেল্ড অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে এক রকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি।

কথাটা যেদিন বলা হল, সেদিনই এক কাণ্ড ঘটল। জনহীন ভেল্ডে সূর্য অস্ত গেলে ওরা একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে

তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বাললে—শঙ্কর জল খুঁজতে বেরুল। সঙ্গে আলভারেজের বন্দুকটা নিয়ে গেল, কিন্তু মাত্র দুটি টোটা। আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরে বেলাটুকু গেল, পাতলা অন্ধকারে সমস্ত প্রান্তরকে ধীরে-ধীরে আবৃত করে দিলে। শঙ্কর শপথ করে বলতে পারে, সে আধঘণ্টার বেশি হাঁটেনি। হঠাৎ চারধারে চেয়ে শঙ্করের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল, যেন কী একটা বিপদ আসচে, তাঁবুতে ফেরা ভালো। দূরে দূরে ছোট-বড় পাহাড়, একই রকম দেখতে সবদিক, কোনো চিহ্ন নেই, সব একাকার!

মিনিট পাঁচ-ছয় হাঁটবার পরই শঙ্করের মনে হল সে পথ হারিয়েচে। তখন আলভারেজের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু তখনো সে অনভিজ্ঞতার দরুন বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পারলে না। হেঁটেই যাচ্ছে—হেঁটেই যাচ্ছে—একবার মনে হয় সামনে, একবার মনে হয় বাঁয়ে, একবার মনে হয় ডাইনে। তাঁবুর আগুনের কুণ্ডটা দেখা যায় না কেন। কোথায় সেই ছোট পাহাড়টা?

দুঘণ্টা হাঁটবার পর শঙ্করের খুব ভয় হল। ততক্ষণে সে বুঝেচে যে, সে সম্পূর্ণরূপে পথ হারিয়েচে এবং ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। একা তাকে রোডেসিয়ার এই জনমানবশূন্য, সিংহসঙ্কুল অজানা প্রান্তরে রাত কাটাতে হবে—অনাহারে এবং এই কনকনে শীতে বিনা কম্বলে ও বিনা আগুনে। সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাঁড়ালো যে, পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে অর্থাৎ পথ হারানোর চব্বিশ ঘণ্টা পরে, উদভ্রান্ত, তৃষ্ণায় মুমূর্ষু শঙ্করকে, ওদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে, একটা ইউফোর্বিয়া গাছের তলা থেকে আলভারেজ উদ্ধার করে তাঁবুতে নিয়ে এল।

আলভারেজ বললে—তুমি যে পথ ধরেছিলে শঙ্কর, তোমাকে আজ খুঁজে বার করতে না পারলে তুমি গভীর থেকে গভীরতর মরুপ্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, কাল দুপুর নাগাদ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে। এর আগে তোমার মতো অনেকেই রোডেসিয়ার ভেল্ডে এ ভাবে মারা গিয়েচে। এ সব ভয়ানক জায়গা। তুমি আর কখনো তাঁবু থেকে ও রকম বেরিও না, কারণ তুমি আনাড়ি। মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার জানা নেই, ডাহা মারা পড়বে।

শঙ্কর বললে—আলভারেজ, তুমি দুবার আমার প্রাণ রক্ষা করলে, এ আমি ভুলব না।

আলভারেজ বললে—ইয়্যাং ম্যান, ভুলে যাচ্চ যে তার আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি না থাকলে ইউগাণ্ডার তৃণ-ভূমিতে আমার হাড়গুলো শাদা হয়ে আসত এতদিনে।

মাস দুই ধরে রোডেসিয়া ও এঙ্গোলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভেল্ড অতিক্রম করে, অবশেষে দূরে মেঘের মতো পর্বতশ্রেণী দেখা গেল। আলভারেজ ম্যাপ মিলিয়ে বললে—ওই হচ্চে আমাদের গন্তব্যস্থান, রিখটারসভেল্ড পর্বত, এখনো এখান থেকে

চল্লিশ মাইল হবে। আফ্রিকার এই সব খোলা জায়গায় অনেক দূর থেকে জিনিস দেখা যায়।

এ অঞ্চলে অনেক বাওবাব গাছ। শঙ্করের এ গাছটা বড় ভালো লাগে—দূর থেকে যেন মনে হয় বট কি অশ্বত্থ গাছের মতো কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায় বাওবাব গাছ, ছায়াবিরল অথচ বিশাল, আঁকা-বাঁকা, সারা গায়ে যেন বড়-বড় আঁচিল কি আব বেরিয়েচে, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা বেঁটে, কুদর্শন, কুব্জ দৈত্য। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখানে-ওখানে প্রায় সর্বত্রই দূরে নিকটে বড়-বড় বাওবাব গাছ দাঁড়িয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলার দুর্জয় শীতে তাঁবুর সামনে আগুন করে বসে আলভারেজ বললে—এই যে দেখচ রোডেশিয়ার ভেল্ড অঞ্চল, এখানে হীরে ছড়ানো আছে সর্বত্র, এটা হীরের খনির দেশ। কিম্বার্লি খনির নাম নিশ্চয় শুনেচ। আরও অনেক ছোটোখাটো খনি আছে, এখানে-ওখানে ছোট বড় হীরের টুকরো কত লোক পেয়েচে, এখনো পায়।

কথা শেষ করেই বলে উঠল—ও কারা ?

শঙ্কর সামনে বসে ওর কথা শুনছিল। বললে—কোথায় কে ?

কিন্তু আলভারেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার হাতের বন্দুকের গুলির মতোই অব্যর্থ, একটু পরে তাঁবু থেকে দূরে অন্ধকারে কয়েকটি অস্পষ্ট মূর্তি এদিকে এগিয়ে আসচে, শঙ্করের চোখে পড়ল। আলভারেজ বললে—শঙ্কর, বন্দুক নিয়ে এসো, চট করে যাও, টোটা ভরে—



বন্দুক হাতে শঙ্কর বাইরে এসে দেখলে, আলভারেজ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করচে, কিছুদূরে অজানা মূর্তি কয়টি এখনো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আসচে। একটু পরে তারা এসে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের বাইরে দাঁড়াল। শঙ্কর চেয়ে দেখলে আগন্তুক কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়—তাদের হাতে কিছু নেই, পরনে লেংটি, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক—সুগঠিত চেহারা। তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল, যেন কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্তি।

আলভারেজ জুলু ভাষায় বললে—কি চাও তোমরা?

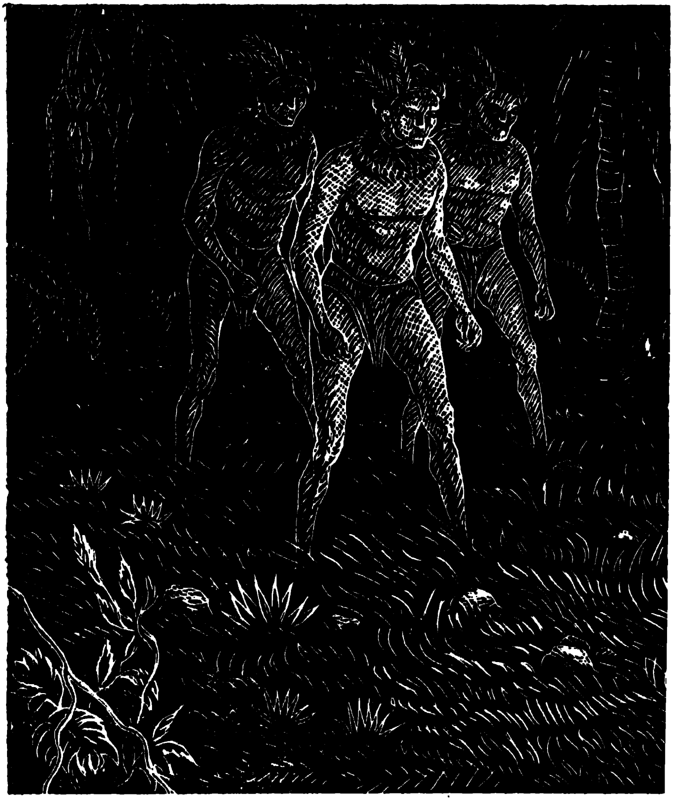
ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা চলল, তার পর ওরা সব মাটির উপর বসে পড়ল। আলভারেজ বললে—শঙ্কর ওদের খেতে দাও।

তারপর অনুচ্চস্বরে বললে—বড় বিপদ। খুব হুঁসিয়ার, শঙ্কর।

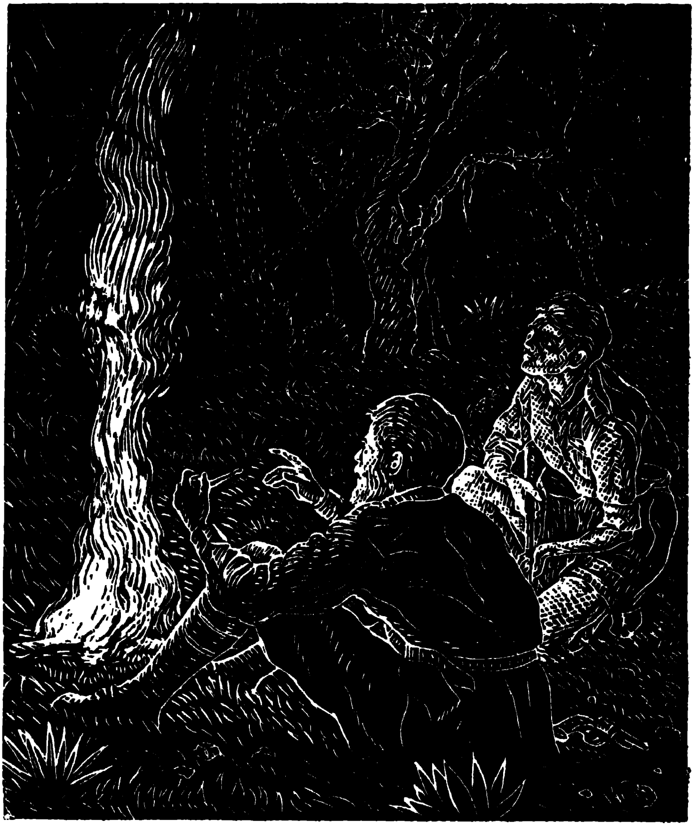
টিনের খাবার খোলা হল। সকলের সামনেই খাবার রাখলে শঙ্কর। আলভারেজও ওই সঙ্গে আবার খেতে বসল যদিও সে ও শঙ্কর সন্ধ্যার সময়েই তাদের নৈশ-আহার শেষ করেচে। শঙ্কর বুঝলে আলভারেজের কোনো মতলব আছে, কিংবা এদেশের রীতি অতিথির সাথে খেতে হয়।

আলভারেজ খেতে-খেতে জুলু ভাষায় আগন্তুকদের সঙ্গে গল্প করচে, অনেকক্ষণ পরে খাওয়া শেষে ওরা চলে গেল। যাবার আগে সবাইকে একটা করে সিগারেট দেওয়া হল।

ওরা চলে গেলে আলভারেজ বললে—ওরা মাটাবেল জাতির



লোক! ভয়ানক দুর্দান্ত, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। শয়তানকেও ভয় করে না। ওরা সন্দেহ করেচে আমরা ওদের দেশে এসেচি হীরের খনির সন্ধানে। আমরা যে জায়গাটায় আছি, এটা ওদের একজন সর্দারের রাজ্য।



কোনো সভ্য গবর্ণমেণ্টের আইন এখানে খাটবে না। ধরবে আর নিয়ে গিয়ে পুরিয়ে মারবে। চল আমরা তাঁবু তুলে রওনা হই।

শঙ্কর বললে—তবে তুমি বন্দুক আনতে বললে কেন?

আলভারেজ হেসে বললে—দেখ, ভেবেছিলাম যদি ওরা

খেয়েও না ভোলে, কিংবা কথাবার্তায় বুঝতে পারি যে, ওদের মতলব খারাপ, ভোজনরত অবস্থাতেই ওদের গুলি করব। এই ছ্যাখো রিভলবার পিছনে রেখে তবে খেতে বসেছিলাম, এ কটাকে সাবাড় করে দিতাম। আমার নাম আলভারেজ, আমিও এককালে শয়তানকে ভয় করতুম না, এখনো করিনে। ওদের হাতের মাছ মুখে পৌঁছবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

আরও পাঁচ-ছদিন পথ চলবার পরে একটা খুব বড় পর্বতের পাদমূলে নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানীর মধ্যে ওরা প্রবেশ করলে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি বিশাল। সে বন দেখে শঙ্করের মনে হল, একবার যদি সে এর মধ্যে পথ হারায় সারাজীবন ঘুরলেও বার হয়ে আসবার সাধ্য তার হবে না। আলভারেজও তাকে সাবধান করে দিয়ে বললে—খুব হুঁসিয়ার শঙ্কর, বনে চলাফেরা যার অভ্যাস নেই, সে পদে-পদে এই সব বনে পথ হারাবে। অনেক লোক বেঘোরে পড়ে বনের মধ্যে মারা পড়ে। মরুভূমির মধ্যে যেমন পথ হারিয়ে ঘুরেছিলে, এর মধ্যেও ঠিক তেমনই পথ হারাতে পার। কারণ এখানে সবই একরকম, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেবার কোনো চিহ্ন নেই। ভালো বুশম্যান না হলে পদে-পদে বিপদে পড়তে হবে। বন্দুক না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না, এটিও যেন মনে থাকে। মধ্য-আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়!

শঙ্করকে তা না বললেও চলত, কারণ এসব অঞ্চল যে শখের পার্ক নয়, তা এর চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেচে। সে জিগগেস করলে—তোমার সেই হলদে হীরের খনি কতদূরে? এই তো রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা, ম্যাপে যতদূর বোঝা যাচ্ছে।

আলভারেজ হেসে বললে—তোমার ধারণা নেই বললাম যে। আসল রিখটারসভেল্ডের এটা বাইরের থাক্। এরকম আরো অনেক থাক্ আছে। সমস্ত অঞ্চলটা এত বিশাল যে পুবে সত্তর মাইল ও পশ্চিমদিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্যন্ত গেলেও এ বন পাহাড় শেষ হবে না। সর্বনিম্ন প্রস্থ চল্লিশ মাইল। সমস্ত জড়িয়ে আট-ন-হাজার বর্গমাইল সমস্ত রিখটারসভেল্ড পার্বত্য অঞ্চল ও অরণ্য। এই বিশাল অজানা অঞ্চলের কোনখানটাতে এসেছিলুম আজ সাত-আট বছর আগে, ঠিক সে জায়গাটা খুঁজে বার করা কি ছেলেখেলা ইয়্যাং ম্যান্?

শঙ্কর বললে—এদিকে খাবার ফুরিয়েচে, শিকারের ব্যবস্থা দেখতে হয়, নইলে কাল থেকে বায়ুভক্ষণ করা ছাড়া উপায় নেই।

আলভারেজ বললে—কিছু ভেব না। দেখচ না গাছে-গাছে বেবুনের মেলা। কিছু না মেলে, বেবুনের দাপনা ভাজা আর কফি দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাব আজ থেকে। আজ আর নয়, তাঁবু ফেল, বিশ্রাম করা যাক।

একটা বড় গাছের নিচে তাঁবু খাটিয়ে ওরা আগুন জ্বালালে। শঙ্কর রান্না করলে, আহারাদি শেষ করে যখন দুজনে আগুনের সামনে বসেচে, তখনো বেলা আছে।

আলভারেজ কড়া তামাকের পাইপ টানতে-টানতে বললে—জানো শঙ্কর, আফ্রিকার এইসব অজানা অরণ্যে এখনো কত জানোয়ার আছে, যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত্র রাখে না? খুব কম সভ্য মানুষ এখানে এসেচে। ওকাপি বলে যে জানোয়ার সে তো প্রথম দেখা গেল ১৯০০ সালে। এক ধরনের বুনো শুওর আছে, যা সাধারণ বুনো শুওরের প্রায় তিনগুণ বড় আকারে। ১৮৮৮ সালে মোজেস কাউলে, পৃথিবী পর্যটক ও বড় শিকারী, সর্বপ্রথম ওই বুনো শুওরের সন্ধান পান বেলজিয়াম কঙ্গোর লুয়ালাবু অরণ্যের মধ্যে। তিনি বহু কষ্টে একটা শিকারও করেন এবং নিউইয়র্ক প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত মিউজিয়ামে উপহার দেন। বিখ্যাত রোডেসিয়ান মনস্টারের নাম শুনেচ?

শঙ্কর বললে—না, কী সেটা?

—শোনো তবে। রোডেসিয়ার উত্তর সীমায় প্রকাণ্ড জলাভূমি আছে। ওদেশের অসভ্য জুলুদের মধ্যে অনেকেই এক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারকে এই জলাভূমিতে মাঝে-মাঝে দেখেচে। ওরা বলে তার মাথা কুমিরের মতো, গণ্ডারের মতো তার শিং আছে, গলাটা অজগর সাপের মতো লম্বা ও আঁসওয়ালা দেহটা জলহস্তীর মতো, লেজটা কুমিরের মতো। বিরাটদেহ এই জানোয়ারের প্রকৃতিও খুব হিংস্র। জল ছাড়া কখনো ডাঙায় এ জানোয়ারকে দেখা যায়নি। তবে এই সব অসভ্য দেশী লোকের অতিরঞ্জিত বিবরণ বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু ১৮৮০ সালে জেমস মার্টিন বলে একজন প্রসপেক্টর

রোডেসিয়ার এই অঞ্চলে বহুদিন ঘুরেছিল সোনার সন্ধানে। মিস্টার মার্টিন আগে জেনারেল ম্যাথিউসের এডিকং ছিলেন, নিজে একজন ভালো ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ববিদও ছিলেন। ইনি তাঁর ডায়েরির মধ্যে রোডেসিয়ার এই অজ্ঞাত জানোয়ার দূর থেকে দেখেচেন বলে উল্লেখ করে গিয়েচেন। তিনিও বলেন, জানোয়ারটা আকৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপের মতো ও বেজায় বড়। কিন্তু তিনি জোর করে কিছু বলতে পারেননি, কারণ খুব ভোরের কুয়াশার মধ্যে কোভিরাণ্ডো হ্রদের সীমানায়, জলাভূমিতে আবছায়া ভাবে তিনি জানোয়ারটাকে দেখেছিলেন। জানোয়ারটার ঘোড়ার চিঁহিঁ ডাকের মতো ডাক শুনেই তাঁর সঙ্গের জুলু চাকরগুলো উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে-পালাতে বললে—সাহেব পালাও, পালাও, ডিঙ্গোনেক! ডিঙ্গোনেক! ডিঙ্গোনেক ঐ জানোয়ারটার জুলু নাম। দু-তিন বছরে এক-আধবার দেখা দেয় কি না দেয়, কিন্তু সেটা এতই হিংস্র যে তার আবির্ভাব সে দেশের লোকের পক্ষে ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। মিস্টার মার্টিন বলেন, তিনি তাঁর ৩০৩ টোটা গোটা দুই উপরি-উপরি ছুঁড়েছিলেন জানোয়ারটার দিকে। অত দূর থেকে তাক হল না, রাইফেলের আওয়াজে সেটা সম্ভবত জলে ডুব দিলে।

শঙ্কর বললে—তুমি কী করে জানলে এ সব? মার্টিনের ডায়েরি ছাপানো হয়েছিল নাকি?

—না, অনেকদিন আগে বুলাওয়েও ক্রনিকল কাগজে মিস্টার

মার্টিনের এই ঘটনাটা বেরিয়েছিল। আমি তখন সবে এদেশে এসেচি। রোডেসিয়া অঞ্চলে আমিও প্রসপেকটিং করে বেড়াতুম বলে জানোয়ারটার বিবরণ আমাকে খুব অকৃষ্ট করে। কাগজখানা অনেকদিন আমার কাছে রেখেও দিয়েছিলুম। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। ওরাই নাম দিয়েছিল জানোয়ারটার রোডেসিয়ান মনস্টার।

শঙ্কর বললে—তুমি কোনো কিছু অদ্ভুত জানোয়ার দেখনি?

প্রশ্নটার সঙ্গে-সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেচে। সেই আবছায়া আলো অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মনে হল—হয়তো শঙ্করের ভুল হতে পারে—কিন্তু শঙ্করের মনে হল সে দেখল আলভারেজ, দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক আলভারেজ, দুঁদে ও অব্যর্থলক্ষ্য আলভারেজ, ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল, এবং—এবং সেটাই সকলের চেয়ে আশ্চর্য—যেন পরক্ষণেই শিউরে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে আলভারেজ যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই চার পাশের জনমানবহীন ঘন জঙ্গল ও রহস্যভরা দুরারোহ পর্বতমালার দিকে একবার চেয়ে দেখলে, কোনো কথা বললে না। যেন এই পর্বত জঙ্গলে বহুকাল পরে এসে অতীতের কোনো বিভীষিকাময় পুরাতন ঘটনা ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠেচে—যে স্মৃতিটা ওর পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়।

আলভারেজ ভয় পেয়েছে!

অবাক। আলভারেজের ভয়! শঙ্কর ভাবতেও পারে না!

কিন্তু সেই ভয়টা অলক্ষিতে এসে শঙ্করের মনেও চেপে বসল। এই সম্পূর্ণ অজানা বিচিত্র রহস্যময় বনানী, এই বিরাট পর্বত প্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে যুগ যুগ ধরে গোপন করে আসচে। যে বীর যে নির্ভীক এগিয়ে এসো সে—কিন্তু মৃত্যুপণে ক্রয় করতে হবে সেই গহন রহস্যের সন্ধান।

রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা ভারতের দেবাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয়—এদেশের মাসাই, জুলু, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতোই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসলোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না।

॥ সাত ॥

তার পর দিন দুই কেটে গেল। ওরা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে। পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উতরাই, মাঝে-মাঝে কর্কশ ও দীর্ঘ টুসক-ঘাসের বন, জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, ঝরনা এক-আধটা যদিও বা দেখা যায়, আলভারেজ তাদের জল ছুঁতেও দেয় না। দিব্যি স্ফটিকের মতো নির্মল জল পড়ছে ঝরনা বেয়ে, সুশীতল ও লোভনীয়, তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে সে লোভ সম্বরণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু আলভারেজ জলের বদলে ঠাণ্ডা চা খাওয়াবে তবুও জল খেতে দেবে না। জলের তৃষ্ণা ঠাণ্ডা চায়ে দূর হয় না, তৃষ্ণার কষ্টই সব চেয়ে বেশি কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল শঙ্করের। এক জায়গায় টুসক-ঘাসের বন বেজায় ঘন। তবে উপরে

ওদের চারধার ঘিরে সেদিন কুয়াশাও খুব গভীর। হঠাৎ বেলা উঠলে নিচের কুয়াশা সরে গেল। সামনে চেয়ে শঙ্করের মনে হল, খুব বড় একটা চড়াই তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে, কত উঁচু সেটা তা জানা সম্ভব নয়, কারণ নিবিড় কুয়াশা কিংবা মেঘে তার উপরের দিকটা সম্পূর্ণরূপে আবৃত।

আলভারেজ বললে—রিখটারসভেল্ডের আসল রেঞ্জ।

শঙ্কর বললে—এটা পার হওয়া কী দরকার?

আলভারেজ বললে—এজন্যে দরকার যে সেবার আমি আর জিম দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিলুম এই পর্বতশ্রেণীর পাদমূলে কিন্তু আসল রেঞ্জ পার হইনি। যে নদীর ধারে হলদে হীরে পাওয়া গিয়েছিল, তার গতি পুব থেকে পশ্চিমে। এবার আমরা যাচ্ছি উত্তর থেকে দক্ষিণে, সুতরাং, পর্বত পার হয়ে ওপারে না গেলে কি করে সেই নদীটার ঠিকানা করতে পারি।

শঙ্কর বললে—আজ যে রকম কুয়াশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটু অপেক্ষা করা যাক না কেন? আর একটু বেলা বাড়ুক।

তাঁবু ফেলে আহারাদি সম্পন্ন করা হল। বেলা বাড়লেও কুয়াশা তেমন কাটল না। শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন নেই। চোখ মুছতে-মুছতে তাঁবুর বাইরে এসে সে দেখলে আলভারেজ চিন্তিত মুখে ম্যাপ খুলে বসে আসে। শঙ্করকে দেখে বললে—শঙ্কর, আমাদের এখনো অনেক ভুগতে হবে। সামনে চেয়ে দেখ।

আলভারেজের কথার সঙ্গে-সঙ্গে সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোখে পড়ল। কুয়াশা কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বতের প্রধান থাক্ ধাপে-ধাপে উঠে মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেচে। পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত, কিন্তু উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্যের রঙিন আলোয় দেবলোকের কনক-দেউলের মতো বহুদূর নীল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে!

কিন্তু সামনের পর্বতাংশ সম্পূর্ণ দুরারোহ, শুধুই খাড়া-খাড়া উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ—কোথাও একটু ঢালু নেই। আলভারেজ বললে—এখান থেকে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, শঙ্কর। দেখেই বুঝেচ নিশ্চয়। পাহাড়ের কোলে-কোলে পশ্চিম দিকে চল। যেখানে ঢালু এবং নিচু পাব, সেখান দিয়েই পাহাড় পার হতে হবে। কিন্তু এই দেড়শো মাইল লম্বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে কোথায় সে রকম জায়গা আছে, এ খুঁজতেই তো এক মাসের উপর যাবে দেখচি।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পশ্চিম দিকে যাওয়ার পর এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল যেখানে পর্বতের গা বেশ ঢালু, সেখান দিয়ে পর্বতে ওঠা চলতে পারে।

পরদিন খুব সকাল থেকে পর্বতারোহণ শুরু হল। শঙ্করের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে-ছটা। সাড়ে-আটটা বাজতে না বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। যে জায়গাটা দিয়ে তারা উঠচে—সেখানে পর্বতের খাড়াই চার মাইলের মধ্যে উঠেছে ছ-হাজার

ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হলেও কি ভীষণ দুরারোহ তা সহজেই বোঝা যাবে। তা ছাড়া যতই উপরে উঠচে, অরণ্য ততই নিবিড়তর, ঘন অন্ধকার চারদিকে। বেলা হয়েচে, রোদ উঠেচে, অথচ সূর্যের আলো ঢোকেনি জঙ্গলের মধ্যে—আকাশই চোখে পড়ে না তায় সূর্যের আলো!

পথ বলে কোনো জিনিস নেই। চোখের সামনে শুধুই গাছের গুঁড়ি যেন ধাপে-ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেচে। কোথা থেকে জল পড়চে, কে জানে, পায়ের নিচের প্রস্তর আর্দ্র ও পিচ্ছিল, প্রায় সর্বত্রই শেওলা-ধরা। পা পিছলে গেলে গড়িয়ে নিচের দিকে বহুদূর চলে গিয়ে তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে আহত হতে হবে।

শঙ্কর বা আলভারেজ কারো মুখে কথা নেই। উত্তুঙ্গ পথে উঠবার কষ্টে দুজনেই অবসন্ন, দুজনেরই ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়চে। শঙ্করের কষ্ট আরও বেশি, বাঙলার সমতল ভূমিতে আজন্ম মানুষ হয়েচে, পাহাড়ে ওঠার অভ্যাসই নেই কখনো।

শঙ্কর ভাবচে, আলভারেজ কখন বিশ্রাম করতে বলবে? সে আর উঠতে পারচে না, কিন্তু যদি সে মরেও যায়, একথা আলভারেজকে সে কখনোই বলবে না যে, সে আর পারচে না। হয়তো তাতে আলভারেজ ভাববে ইস্ট ইণ্ডিজের মানুষগুলো দেখচি নিতান্তই অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্বত ও অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি—এমন কোনো কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোট হয়ে যায়।



বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য ! মাঝে-মাঝে ছোটো-খাটো ঝরনা বনের মধ্যে দিয়ে খুব উপর থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে-ডালে নানা রঙের টিয়াপাখি চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্চে। বড়-বড় ঘাসের মাথায় শাদা-শাদা ফুল, অর্কিডের ফুল ঝুলচে গাছের ডালের গায়ে, গুঁড়ির গায়ে।

হঠাৎ শঙ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে-মাঝে লম্বা দাড়ি-গোঁফওয়ালা বালখিল্য মুনিদের মতো ও কারা বসে রয়েচে ! তারা সবাই চুপচাপ বসে, মুনিজনোচিত গাম্ভীর্যে ভরা। ব্যাপার কী ?

আলভারেজ বললে—ও কলোবাস জাতীয় মাদী বাঁদর। পুরুষ জাতীয় কলোবাস বাঁদরের দাড়ি-গোঁফ নেই, স্ত্রী জাতীয় কলোবাস বাঁদরের হাতখানেক লম্বা দাড়ি-গোঁফ গজায় এবং তারা বড় গম্ভীর, দেখেই বুঝতে পাচ্চ।

ওদের কাণ্ড দেখে শঙ্কর হেসেই খুন !

পায়ের তলায় মাটিও নেই, পাথরও নেই—তার বদলে আছে শুধু পচা পাতা ও শুকনো গাছের গুঁড়ির স্তূপ। এই সব বনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাতার রাশি ঝরচে, পচে যাচ্চে, তার উপরে শেওলা পুরু হয়ে উঠচে, ছাতা গজাচ্চে, তার উপরে আবার নতুন-ঝরা পাতার রাশি, আবার পড়চে গাছের ডাল-পালা, গুঁড়ি। জায়গায়-জায়গায় ষাট-সত্তর ফুট গভীর হয়ে জমে রয়েচে এই পাতার স্তূপ।

আলভারেজ ওকে শিখিয়ে দিলে, এইসব জায়গায় খুব

সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে। এমন জায়গা আছে, যেখানে মানুষ চলতে-চলতে ওই ঝরা পাতার রাশির মধ্যে ভুস করে ঢুকে ডুবে যেতে পারে, যেমন অতর্কিতে পথ চলতে-চলতে পুরনো কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। উদ্ধার করা সম্ভব না হলে সে সব ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য।

শঙ্কর বললে—পথের গাছপালা না কাটলে আর তো ওঠা যাচ্চে না, বড় ঘন হয়ে উঠচে।

ক্ষুরের মতো ধারাল চওড়া এলিফ্যাণ্ট ঘাসের বন—যেন রোমান যুগের দ্বিধার তলোয়ার। তার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় দুজনের কেউই নিরাপদ বলে ভাবচে না নিজেকে, দুহাত তফাতে কি আছে দেখা যায় না যখন, তখন সব রকম বিপদের সম্ভাবনাই তো রয়েচে। বাঘ, সিংহ বা বিষাক্ত সাপ কোনোটাই থাকা বিচিত্র নয়।

শঙ্কর লক্ষ্য করচে মাঝে-মাঝে ডুগডুগি বা ঢোল বাজনার মতো একটা শব্দ হচ্চে কোথায় যেন বনের মধ্যে। কোনো অসভ্য জাতির লোক ঢোল বাজাচ্চে নাকি। আলভারেজকে সে জিগগেস করলে।

আলভারেজ বললে—ঢোল নয়, বড় বেবুন কিংবা বনমানুষে বুক চাপড়ে ঐ রকম শব্দ করে। মানুষ এখানে কোথা থেকে আসবে?

শঙ্কর বললে—তুমি যে বলেছিলে এ বনে গরিলা নেই?

—গরিলা সম্ভবত নেই। আফ্রিকার মধ্যে বেলজিয়ান

কঙ্গোর কিছু অঞ্চল, রাওয়েনজির আল্পস্ বা ভিরুঙ্গা আগ্নেয় পর্বতের অরণ্য ছাড়া অন্য কোথাও গরিলা আছে বলে তো জানা নেই। গরিলা ছাড়াও অন্য ধরনের বনমানুষ বুক চাপড়ে ও রকম আওয়াজ করতে পারে।

ওরা সাড়ে চার হাজার ফুটের উপরে উঠেচে। সেদিনের মতো সেখানেই রাত্রির বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হল। একটা বিশাল সত্যিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের রাত্রিকালীন শব্দ এত বিচিত্র ধরনের ও এত ভীতিজনক যে সারারাত শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। শুধু ভয় নয়, ভয় মিশ্রিত একটা বিস্ময়।

কত রকমের শব্দ—হায়নার হাসি, কলোবাস বানরের কর্কশ চিৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক—প্রকৃতিক এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রে কেউ ঘুমোয় না। সমস্ত অরণ্যটা এই গভীর রাত্রে যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠেচে। বছর কয়েক আগে খুব বড় একটা সার্কাসের দল এসে ওদের স্কুল-বোর্ডিংয়ের পাশের মাঠে তাঁবু ফেলেছিল, তাদের জানোয়ারদের চিৎকারে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা রাত্রে ঘুমুতে পারত না—শঙ্করের সেই কথা এখন মনে পড়ল। কিন্তু এসবের চেয়েও মধ্যরাত্রে একদল বনহস্তীর বৃংহিত তাঁবুর অত্যন্ত নিকটে শুনে শঙ্কর এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আলভারেজকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠালে। আলভারেজ বললে—আগুন জ্বলছে তাঁবুর বাইরে, কোনো ভয় নেই, ওরা ঘেঁষবে না এদিকে।

সকালে উঠে আবার উপরে ওঠা শুরু। উঠচে—উঠচে—মাইলের পর মাইল বুনো বাঁশের জঙ্গল, তার তলায় বুনো আদা। ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁদিকের বাঁশবনের তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হস্তিযূথ কচি বাঁশের কোঁড় মড়মড় করে ভাঙতে-ভাঙতে চলে গেল।

পাঁচ হাজার ফুট উপরে কত কি বুনো ফুলের মেলা—টকটকে লাল ইরিথ্রিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেচে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাংলাদেশের বনকলমি



ফুলের মতো, কিন্তু রঙটা অত গাঢ় বেগুনী নয়। সাদা ভেরোনিকা ঘন সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেচে। বন্য কফির ফুল, রঙিন বেগোনিয়া। মেঘের রাজ্যে ফুলের বন, মাঝে-মাঝে শাদা বেলুনের মতো মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে এসে আটকাচ্চে— কখনো বা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্চে।

সাড়ে-সাত হাজার ফুটের উপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। এই পর্যন্ত উঠতে ওদের আরও দুদিন লেগেচে।



আর অসহ্য কষ্ট, কোমর-পিঠ ভেঙে পড়চে। এখানে বনানীর মূর্তি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলচে—সে শেওলা কোথাও-কোথাও এত লম্বা যে গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মতো হয়েচে—বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্চে, তার উপর কোথাও সূর্যের আলো নেই, সব সময়েই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করচে এক অপার্থিব ধরনের নিস্তব্ধতা—বাতাস বইচে তারও শব্দ নেই, পাখির কূজন নেই সে বনে—মানুষের গলার স্বর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোনো অন্ধকার নরকে দীর্ঘশ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েচে ওরা!

সেদিন অপরাহ্নে যখন আলভারেজ তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করবার হুকুম দিলে—তখন তাঁবুর বাইরে বসে একপাত্র কফি খেতে-খেতে শঙ্করের মনে হল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী, পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ যখন কোনো একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করেনি, যে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরাট-কায় সরীসৃপের দল জগৎজোড়া বন-জঙ্গলের নিবিড় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত—সৃষ্টির সেই অতীত প্রভাতে সে যেন কোনো যাদুমন্ত্রের বলে ফিরে গিয়েচে।

সন্ধ্যার পরেই সমগ্র বনানী নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হল। তাঁবুর বাইরে ওরা আগুন করেচে—সেই আলোর

মণ্ডলীর বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। এ বনের আশ্চর্য নিস্তব্ধতা শঙ্করকে বিস্মিত করেচে। বনানীর সেই বিচিত্র নৈশ শব্দ এখানে স্তব্ধ কেন? আলভারেজ চিন্তিত মুখে ম্যাপ দেখছিল। বললে—শোনো শঙ্কর, একটা কথা ভাবছি। আট হাজার ফুট উঠলাম, কিন্তু এখনো পর্বতের সেই খাঁজটা পেলাম না যেটা দিয়ে আমরা রেঞ্জ পার হয়ে ওপারে যাব। আর কত ওপরে উঠব? যদি ধরো এই অংশে স্যাডলটা না-ই থাকে?

শঙ্করের মনেও খটকা যে না জেগেছে তা নয়। সে আজই ওঠবার সময় মাঝে-মাঝে ফিল্ড গ্লাস দিয়ে উপরের দিকে দেখবার চেষ্টা করেচে, কিন্তু ঘন মেঘে বা কুয়াশায় উপরের দিকটা সর্বদাই আবৃত থাকায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিই তো তারা কত উঠবে আর, সমতল খাঁজ যদি না পাওয়া যায়? আবার নিচে নামতে হবে, আবার অন্য জায়গা বেয়ে উঠতে হবে। দফা সারা!

সে বললে—ম্যাপে কি বলে?

আলভারেজের মুখ দেখে মনে হল ম্যাপের উপর সে আস্থা হারিয়েছে। বললে—এ ম্যাপ অত খুঁটিনাটি ভাবে তৈরি নয়। এ পর্বতে উঠেচে কে যে ম্যাপ তৈরি হবে? এই যে দেখচ —এখানা সার ফিলিপো ডি ফিলিপির তৈরি ম্যাপ, যিনি পর্টুগিজ পশ্চিম-আফ্রিকার ফার্ডিনাণ্ডো পো শৃঙ্গ আরোহণ করে খুব নাম করেন, এবং বছর কয়েক আগে বিখ্যাত

পর্বত আরোহণকারী পর্যটক ডিউক অব আব্রুৎসির অভিযানেও যিনি ছিলেন। কিন্তু রিখটারসভেল্ড তিনি ওঠেননি, এ ম্যাপে পাহাড়ের যে কনটুর ছবি আঁকা আছে, তা খুব নিখুঁত বলে মনে তো হয় না। ঠিক বুঝছিনে।

হঠাৎ শঙ্কর বলে উঠল—ও কী!

তাঁবুর বাইরে প্রথমে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ, এবং পরক্ষণেই একটা কষ্টকর কাশির শব্দ পাওয়া গেল—যেন থাইসিসের রোগী খুব কষ্টে কাতরভাবে কাশচে। একবার··· দুবার···তারপরেই শব্দটা থেমে গেল! কিন্তু সেটা মানুষের গলার শব্দ নয়, শুনবামাত্রই শঙ্করের সে কথা মনে হল।

রাইফেল নিয়ে সে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বার হতে যাচ্ছে, আলভারেজ তাড়াতাড়ি উঠে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলে। শঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বললে—কেন, কিসের শব্দ ওটা? বলে আলভারেজের দিকে চাইতেই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে! শব্দটা শুনেই কি?

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের মণ্ডলীর বাইরে, নিবিড় অন্ধকারে, একটা ভারী অথচ লঘুপদ জীব যেন বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে—বেশ মনে হল।

দুজনেই খানিকটা চুপচাপ, তারপরে আলভারেজ বললে—আগুনে কাঠ ফেলে দাও! বন্দুক দুটো ভরা আছে কিনা দেখ। ওর মুখের ভাব দেখে শঙ্কর ওকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলে না।

রাত্রি কেটে গেল।

পরদিন সকালে শঙ্করেরই ঘুম ভাঙল আগে। তাঁবুর বাইরে এসে কফি করবার আগুন জ্বালতে সে তাঁবু থেকে কিছুদূরে কাঠ ভাঙতে গেল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ভিজে মাটির উপর একটা পায়ের দাগ, লম্বায় দাগটা এগারো ইঞ্চির কম নয়, কিন্তু পায়ে তিনটে মাত্র আঙুল। তিন আঙুলেরই দাগ বেশ স্পষ্ট। পায়ের দাগ ধরে সে এগিয়ে গেল—আরও অনেকগুলো সেই পায়ের দাগ আছে, সবগুলোতেই সেই তিন আঙুল।

শঙ্করের মনে পড়ল ইউগাণ্ডার স্টেশনঘরে আলভারেজের মুখে শোনা জিম কার্টারের মৃত্যুকাহিনী। গুহার মুখে বালির উপর সেই অজ্ঞাত হিংস্র জানোয়ারের তিন আঙুলওয়ালা পায়ের দাগ। কাফির গ্রামের সেই সর্দারের মুখে শোনা গল্প।

কাল রাত্রে আলভারেজের বিবর্ণ মুখও সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল। আর একদিনও আলভারেজ ঠিক এই রকমই ভয় পেয়ে ছিল, যেদিন পর্বতের পাদমূলে ওরা প্রথম এসে তাঁবু পাতে।

বুনিপ! কাফির সর্দারের গল্পের সেই বুনিপ! রিখটারসভেল্ড পর্বত ও অরণ্যের বিভীষিকা, যার ভয়ে শুধু অসভ্য মানুষ কেন, অন্য কোনো বন্য জন্তু পর্যন্ত এই আট হাজার ফুটের উপরকার বনে আসে না। কাল রাত্রে কোনো জানোয়ারের শব্দ পাওয়া যায়নি কেন, এখন তা শঙ্করের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আলভারেজ পর্যন্ত ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর গলার

শব্দ শুনে। বোধহয় ও শব্দের সঙ্গে আলভারেজের পূর্বে পরিচয় ঘটেছে।

আলভারেজের ঘুম ভাঙতে সেদিন একটু দেরি হল। গরম কফি এবং কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে সে আবার সেই নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ আলভারেজ, যে মানুষকেও ভয় করে না, শয়তানকেও না। শঙ্কর ইচ্ছে করেই আলভারেজকে ঐ অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালে না, কি জানি যদি আলভারেজ বলে বসে—এখনো পাহাড়ের স্যাডল্ পাওয়া গেল না, তবে নেমে যাওয়া যাক।

সকালে সেদিন খুব মেঘ করে ঝম-ঝম করে বৃষ্টি নামল। পর্বতের ঢাল বেয়ে যেন হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে নিচে নামচে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। এতটা উঠেচে ওরা কিন্তু প্রতি হাজার ফুট উপর থেকে নিচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে সেগুলিকে সমতলভূমির অরণ্য বলে ভ্রম হচ্ছে—কাজেই প্রথমটা মনে হয় যেন কতটুকুই বা উঠেচি, এটুকু তো।

বৃষ্টি সেদিন থামল না। বেলা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আলভারেজ উঠবার হুকুম দিলে। শঙ্কর এটা আশা করেনি। এখানে শঙ্কর কর্মী শ্বেতাঙ্গ-চরিত্রের একটা দিক লক্ষ্য করলে। তার মনে হচ্ছিল, কেন, এই বৃষ্টিতে মিছিমিছি বার হওয়া? একটা দিনে কি এমন হবে? বৃষ্টি-মাথায় পথ চলে লাভ?

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে ঘন অরণ্যানী ভেদ করে সেদিন

ওরা সারাদিন উঠল। উঠচে, উঠচে, উঠচেই—শঙ্কর আর পারে না। কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র, তাঁবু, সব ভিজে একাকার, একখানা রুমাল পর্যন্ত শুকনো নেই কোথাও। শঙ্করের কেমন একটা অবসাদ এসেছে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল, তখন ওর মনে হল—এই অজানা দেশে অজানা পর্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন অনির্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে চলেছে সে কোথায়? আলভারেজ কে তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হীরের খনিতে তার দরকার নেই। বাঙলাদেশের খড়ে-ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখিদের কাকলি—সে সব যেন কতদূরের কোন অবাস্তব স্বপ্ন-রাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি সে সবের চেয়ে মূল্যবান নয়।

কিন্তু তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময় রাত্রের বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই, বাঙলা বলে কোনো দেশ নেই, সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে। সে আর কোথাও ফিরতে চায় না, হীরে চায় না, অর্থ চায় না—পৃথিবী থেকে বহু ঊর্ধ্বের এক কৌমুদীশুভ্র দেবলোকের এখন সে অধিবাসী। তার চারধারে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে তা

দেখেনি। সে গহন নিস্তব্ধতা, এর আগে কোনো মানুষ অনুভব করেনি। জনমানবহীন বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বত ও অরণ্য, এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য কচিৎ ঘটে।

সেই রাত্রে ঘুম থেকে ও ধড়মড়িয়ে উঠল আলভারেজের ডাকে! আলভারেজ ডাকচে—শঙ্কর, শঙ্কর, ওঠো বন্দুক বাগাও—

—কী, কী?

তারপর ও কান পেতে শুনলে—তাঁবুর চারপাশে কে যেন ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্চে তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েচে, তাঁবুর বাইরে অন্ধকারই বেশি, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েচে, কিছুই দেখা যাচ্চে না। তাঁবুর দরজার মুখে আগুন তখনো একটু-একটু জ্বলচে—কিন্তু তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোট, আলোর জ্যোতিও ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না।

হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল—গাছপালা ভেঙে একটি ভারি জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালাল যেন। তাঁবুর সকলে সজাগ হয়ে উঠেচে, এখন আর অতর্কিতে শিকারের সুবিধে হবে না—বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝতে পেরেচে।

জানোয়ারটা যাই হোক না কেন, তার যেন বুদ্ধি আছে, বিচারের ক্ষমতা আছে, মস্তিষ্ক আছে।

আলভারেজ রাইফেল্স হাতে টর্চ জ্বেলে বাইরে গেল। শঙ্করও গেল ওর পিছনে-পিছনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, তাঁবুর উত্তর-পূর্বকোণের জঙ্গলের চারা গাছপালার উপর দিয়ে যেন একটা ভারি স্টিম রোলার চলে গিয়েচে। আলভারেজ সেইদিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বার দুই আওয়াজ করল।

কোনো দিকে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

ফিরবার সময় তাঁবুর ঠিক দরজার মুখে আগুনের কুণ্ডের অতি নিকটেই একটা পায়ের দাগ দুজনেরই চোখে পড়ল। মাত্র তিনটে আঙুলের দাগ ভিজে মাটির উপর সুস্পষ্ট।

এতে প্রমাণ হয়, জানোয়ারটা আগুনকে ডরায় না। শঙ্করের মনে হল, যদি ওদের ঘুম না ভাঙত, তবে সেই অজ্ঞাত বিভীষিকাটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে একটুও দ্বিধা করত না, এবং তারপরে কি ঘটত তা কল্পনা করে কোনো লাভ নেই। আলভারেজ বললে—শঙ্কর, তুমি তোমার ঘুম শেষ কর, আমি জেগে আছি।

শঙ্কর বললে—না, তুমি ঘুমোও আলভারেজ।

আলভারেজ ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—পাগল, তুমি জেগে কিছু করতে পারবে না, শঙ্কর। ঘুমিয়ে পড়, ঐ দেখ দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, আবার ঝড়বৃষ্টি আসবে, রাত শেষ হয়ে আসচে, ঘুমোও। আমি বরং একটু কফি খাই।

রাত ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে-সঙ্গে যেমনি বিদ্যুৎ, তেমনি মেঘগর্জন। সে বৃষ্টি চলল সমানে

সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শঙ্করের মনে হল, পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ শুরু হয়েছে, প্রলয়ের দেবতা সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেচেন বুঝি। বৃষ্টির বহর দেখে আলভারেজ পর্যন্ত দমে গিয়ে তাঁবু ওঠাবার নাম মুখে আনতে ভুলে গেল।

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকেল পাঁচটা। বোধ হয় বৃষ্টি না থামলেই ভালো ছিল, কারণ অমনি আলভারেজ চলা শুরু করবার হুকুম দিলে। বাঙালী ছেলের স্বভাবতই মনে হয়— এখন অবেলায় যাওয়া কেন? এত কি সময় বয়ে যাচ্ছে? কিন্তু আলভারেজের কাছে দিন, রাত্রি, বর্ষা, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, সব সমান। সে রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূমির মধ্য দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে উঠচে, উঠচে—এমন সময় আলভারেজ পিছন থেকে বলে উঠল—শঙ্কর দাঁড়াও, ঐ দেখ—

আলভারেজ ফিল্ড গ্লাস দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে বাঁ পাশের পর্বত-শিখরের দিকে চেয়ে দেখচে। শঙ্কর ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। হ্যাঁ, সমতল খাঁজটা পাওয়া গিয়েচে। বেশি দূরেও নয়, মাইল দুইয়ের মধ্যে, বাঁদিক ঘেঁষে।

আলভারেজ হাসিমুখে বললে—দেখেচ স্যাডলটা? থামবার দরকার নেই, চল আজ রাত্রেই স্যাডলের উপর পৌঁছে তাঁবু ফেলব। শঙ্কর আর সত্যিই পারচে না। এই দুর্ধর্ষ পর্টুগিজটার

সঙ্গে হীরের সন্ধানে এসে সে কি ঝকমারি না করেচে! শঙ্কর জানে অভিযানের নিয়মানুযায়ী দলপতির হুকুমের উপর কোনো কথা বলতে নেই। এখানে আলভারেজই দলপতি, তার আদেশ অমান্য করা চলবে না। কোথাও আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও পৃথিবীর ইতিহাসের বড়-বড় অভিযানে সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। সেও মানবে।

অবিশ্রান্ত হাঁটবার পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ওরা এসে স্যাডলে যখন উঠল—শঙ্করের তখন আর এক পা-ও চলবার শক্তি নেই।

স্যাডলটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নয়, কখনো বা দুশো ফুট খাড়া উঠেচে, কখনো বা চার-পাঁচশো ফুট নেমে গিয়েচে এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ দুরারোহ—যতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড়-বড় বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথ্রিনা, পেনসিয়ানা, রিঠাগাছ, বাঁশ বা বন্য আদা। বিচিত্র বর্ণের অর্কিডের ফুল ডালে-ডালে। বেবুন ও কলোবাস বাঁদর সর্বত্র।

আরও দুদিন ধরে ক্রমাগত নামতে-নামতে রিখটারসভেল্ড পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে ওরা পদার্পণ করল। শঙ্করের মনে হল, এদিকে জঙ্গল যেন আরও বেশি দুর্ভেদ্য ও বিচিত্র। আটলান্টিক মহাসাগরের দিক থেকে সমুদ্রবাষ্প উঠে কতক ধাক্কা খায় পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুণ পর্বতে, বাকিটা আটকায় বিশাল রিখটারসভেল্ডের দক্ষিণ সানুতে —সুতরাং বৃষ্টি এখানে হয় অজস্র, গাছপালার তেজও তেমনি।

দিন পনেরো ধরে সেই বিরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকার সর্বত্র দুজনে মিলে খুঁজেও আলভারেজ বর্ণিত পাহাড়ী নদীর কোনো ঠিকানা বার করতে পারলে না। ছোট-খাটো ঝরনা দু-একটা উপত্যকার উপর দিয়ে বইচে বটে, কিন্তু আলভারেজ কেবলই ঘাড় নাড়ে আর বলে—এসব নয়!

শঙ্কর বলে—তোমার ম্যাপ দেখ না ভালো করে?

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আলভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আলভারেজ বলে—ম্যাপ কি হবে? আমার মনেই গভীর ভাবে আঁকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার ছবি—সে একবার দেখতে পেলেই তখুনি চিনে নেব। এ সে জায়গাই নয়, এ উপত্যকা সে উপত্যকাই নয়।

নিরুপায়! খোঁজ তবে।

একমাস কেটে গেল। পশ্চিম আফ্রিকায় বর্ষা নামল মার্চ মাসের প্রথমে। সে কি ভয়ানক বর্ষা। শঙ্কর তার কিছু নমুনা পেয়ে এসেছে রিখটারসভেল্ড পার হবার সময়ে! উপত্যকা ভেসে গেল পাহাড় থেকে নামা বড়-বড় পার্বত্য ঝরনার জলধারায়। তাঁবু ফেলবার স্থান নেই। একরাত্রে হঠাৎ অতি-বর্ষণের ফলে ওদের তাঁবুর সামনে একটা নিরীহ ক্ষীণকায় ঝরনাধারা ভীমমূর্তি ধারণ করে তাঁবুসুদ্ধ ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় করেছিল—আলভারেজের সজাগ ঘুমের জন্যে যে যাত্রা বিপদ কেটে গেল।

কিন্তু দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। শঙ্কর একদিন ঘোর বিপদে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সে বিপদটাও বড় অদ্ভুত ধরনের।

সেদিন আলভারেজ তাঁবুতে তার নিজের রাইফেল পরিষ্কার করছিল, সেটা শেষ করে রান্না করবে কথা ছিল। শঙ্কর রাইফেল হাতে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে।

আলভারেজ বলে দিয়েছে তাকে এ বনে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে আর বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে। আর একটা খুব মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে, সেটা এই—বনের মধ্যে বেড়াবার সময় হাতের কব্জিতে কম্পাস সর্বদা বেঁধে নিয়ে বেড়াবে এবং যে পথ দিয়ে যাবে, পথের ধারে গাছপালায় কোনো চিহ্ন রেখে যাবে, যাতে ফিরবার সময় সেই সব চিহ্ন ধরে আবার ঠিক ফিরতে পারো। নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

সেদিন শঙ্কর স্প্রিংবক হরিণের সন্ধানে গভীর বনে চলে গিয়েচে। সকালে বেরিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এক জায়গায় একটা বড় গাছের তলায় সে একটু বিশ্রামের জন্যে বসল।

সেখানটাতে চারধারেই বৃহৎ-বৃহৎ বনস্পতির মেলা, আর সব গাছেই গুঁড় ও ডালপালা বেয়ে এক প্রকারের বড়-বড় লতা উঠে তাদের ছোট-ছোট পাতা দিয়ে এমন নিবিড় ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে গাছগুলো জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রঙ দেখা যাচ্ছে না।

কাছেই একটা ছোট জলার ধারে ঝাড়ে-ঝাড়ে মারিপোসা লিলি ফুটে রয়েচে।

খানিকটা সেখানে বসবার পরে শঙ্করের মনে হল তার কি একটা অস্বস্তি হচ্চে। কী ধরনের অস্বস্তি তা সে কিছু বুঝতে পারলে না—অথচ জায়গাটা ছেড়ে উঠে যাবারও ইচ্ছে তার হল না—সে ক্লান্তও বটে, আর জায়গাটা বেশ আরামেরও বটে।

কিন্তু এ তার কী হল? তার সমস্ত শরীরে এত অবসাদ এল কোথা থেকে? ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল নাকি?

অবসাদটা কাটাবার জন্যে সে পকেট হাতড়ে একটা চুরুট বার করে ধরালে। কিসের একটা মিষ্টি-মিষ্টি সুগন্ধ বাতাসে, শঙ্করের বেশ লাগচে গন্ধটা। একটু পরে দেশলাইটা মাটি থেকে কুড়িয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে মনে হল, হাতটা যেন তার নিজের নয়—যেন অন্য কারো হাত, তার মনের ইচ্ছেয় সে হাত নড়ে না।

ক্রমেই তার সর্বশরীর যেন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদে অবশ হয়ে পড়তে চাইল। কি হবে আর বৃথা ভ্রমণে, আলেয়ার পিছু-পিছু বৃথা ছুটে! এইরকম বনের ঘন ছায়ায় নিভৃত লতাবিতানে, অলস স্বপ্নে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে সুখ আর কী আছে?

একবার তার মনে হল, এই বেলা উঠে তাঁবুতে যাওয়া যাক, নতুবা তার কোনো একটা বিপদ ঘটবে যেন। একবার সে উঠবার

চেষ্টাও করতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তার দেহমনব্যাপী অবসাদের জয় হল। অবসাদ নয়, যেন একটা মৃত্নমধুর নেশার আনন্দ। সমস্ত জগৎ তার কাছে তুচ্ছ। সে নেশাটাই তার সারাদেহ অবশ করে আনচে ক্রমশ।

শঙ্কর গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে ভালো করেই শুয়ে পড়ল। বড়-বড় কটনউড গাছের শাখায় আলোছায়ার রেখা বড় অস্পষ্ট, কাছেই কোথাও বুনো পেঁচার ডাক অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে যেন তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসচে। তারপরে কি হল শঙ্কর কিছু জানে না।

আলভারেজ যখন বহু অনুসন্ধানের পর ওর অচৈতন্য দেহটা কটনউড জঙ্গলের ছায়ায় আবিষ্কার করলে, তখন বেলা বেশি নেই। প্রথমটা আলভারেজ ভাবলে, এ নিশ্চয় সর্পাঘাত, কিন্তু দেহটা পরীক্ষা করে সর্পাঘাতের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ মাথার উপরকার ডালপালা ও চারধারে গাছপালার দিকে নজর পড়তেই অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী আলভারেজ ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে। সেখানটাতে সর্বত্র অতি মারাত্মক বিষলতার বন, যার রসে আফ্রিকার অসভ্য মানুষেরা তীরের ফলা ডুবিয়ে নেয়। যার বাতাস এমনি বেশ সুগন্ধ বহন করে, কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে, অনেক সময় পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে, মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য নয়।

তাঁবুতে এসে শঙ্কর দু-তিনদিন শয্যাগত হয়ে রইল। সর্বশরীর ফুলে ঢোল। মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে আর সর্বদাই

তৃষ্ণায় গলা কাঠ। আলভারেজ বললে—যদি তোমাকে সারা রাত ওখানে থাকতে হত, তা হলে সকালবেলা তোমাকে বাঁচানো কঠিন হত।

একদিন একটা ঝরনার জলধারার বালুময় তীরে শঙ্কর হলদে রঙের কী দেখতে পেলে। আলভারেজ পাকা প্রসপেক্টর, সে এসে বালি ধুয়ে সোনার রেণু বার করলে—কিন্তু তাতে সে বিশেষ উৎসাহিত হল না। সোনার পরিমাণ এত কম যে মজুরি পোষাবে না—এক টন বালি ধুয়ে আউন্স তিনেক সোনা হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

শঙ্কর বললে—বসে থেকে লাভ কি, তবু যা সোনা পাওয়া যায়, তিন আউন্স সোনার দামও কম নয়।

সে যেটাকে অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিস বলে মনে করচে, অভিজ্ঞ প্রসপেক্টর আলভারেজের কাছে সেটা কিছুই নয়। তাছাড়া শঙ্করের মজুরির ধারণার সঙ্গে আলভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না। শেষ পর্যন্ত ও কাজ শঙ্করকে ছেড়ে দিতে হল।

ইতিমধ্যে ওরা মাসখানেক ধরে জঙ্গলের নানা অঞ্চলে বেড়ালে। আজ এখানে দুদিন তাঁবু পাতে, সেখান থেকে আর এক জায়গায় উঠে যায়, সেখানে কিছুদিন তন্নতন্ন করে চারধার দেখবার পরে আর এক জায়গায় উঠে যায়। সেদিন অরণ্যের একটা নতুন স্থানে পৌঁছে ওরা তাঁবু পেতেছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে দু-একটা পাখি শিকার করে সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে এসে

দেখলে আলভারেজ বসে চুরুট টানচে, তার মুখ দেখে মনে হল সে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।

শঙ্কর বললে—আমি বলি আলভারেজ, তুমিই যখন বার করতে পারলে না, তখন চল ফিরি।

আলভারেজ বললে—নদীটা তো উড়ে যায়নি, এই বন পর্বতের কোনো না কোনো অঞ্চলে সেটা নিশ্চয়ই আছে।

—তবে আমরা বার করতে পারচিনে কেন?

—আমাদের খোঁজ ঠিকমতো হচ্চে না।

—বল কি আলভারেজ, ছমাস ধরে জঙ্গল চষে বেড়াচ্চি, আবার কাকে খোঁজা বলে?

আলভারেজ গম্ভীর মুখে বললে—কিন্তু মুশকিল হয়েচে কোথায় জানো, শঙ্কর? তোমাকে এখনো কথাটা বলিনি, শুনলে হয়তো খুব দমে যাবে বা ভয় পাবে। আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, এস আমার সঙ্গে।

শঙ্কর অধীর আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর পেছনে-পেছনে চলল। ব্যাপারটা কী?

আলভারেজ একটু দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বললে—শঙ্কর, আমরা আজই এখানে এসে তাঁবু পেয়েছি, ঠিক তো?

শঙ্কর অবাক হয়ে বললে—এ কথার মানে কী? আজই তো এখানে এসেচি না আবার কবে এসেচি?

—আচ্ছা, এই গাছের গুঁড়ির কাছে সরে এসে দেখো তো?

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, গুঁড়ির নরম ছাল ছুরি দিয়ে খুদে কে D. A. লিখে রেখেচে—কিন্তু লেখাটা টাটকা নয়, অন্তত মাসখানেকের পুরনো।

শঙ্কর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে না। আলভারেজের মুখের দিয়ে চেয়ে রইল। আলভারেজ বললে—বুঝতে পারলে না? এই গাছে আমিই মাসখানেক আগে আমার নামের অক্ষর দুটি খুদে রাখি। আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। তুমি তো বুঝতে পারো না, তোমার কাছে সব বনই সমান। এর মানে এখন বুঝেচ? আমরা চক্রাকারে বনের মধ্যে ঘুরচি। এ সব জায়গায় যখন এ রকম হয়, তখন তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বেজায় শক্ত।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝলে ব্যাপারটা। বললে—তুমি বলতে চাও মাসখানেক আগে আমরা এখানে এসেছিলাম?

—ঠিক তাই। বড় অরণ্যে বা মরুভূমিতে এই বিপদ ঘটে। একে বলে ডেথ সার্কল, আমার মনে মাসখানেক আগে প্রথম সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমরা ডেথ সার্কল-এ পড়েচি। সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই গাছের ছালে ঐ অক্ষর দুটি খুদে রাখি। আজ বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল।

শঙ্কর বললে—আমাদের কম্পাসের কী হল? কম্পাস থাকতে দিকভুল হচ্ছে কী ভাবে রোজ-রোজ?

আলভারেজ বললে—আমার মনে হয় কম্পাস খারাপ হয়ে

গিয়েচে। রিখটারসভেল্ড পার হবার সময় সেই যে ভয়ানক ঝড় ও বিদ্যুৎ হয়, তাতেই কি ভাবে ওর চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েচে।

—তাহলে আমাদের কম্পাস এখন অকেজো?

—আমার তাই ধারণা।

শঙ্কর দেখলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। ম্যাপ ভুল, কম্পাস অকেজো, তার উপর ওরা পড়েছে এক ভীষণ দুর্গম গহনারণ্যের মাঝে বিষম মরণঘূর্ণিতে। জনমানুষ নেই, খাবার নেই, জলও নেই বললেই হয়, কারণ যেখানকার সেখানকার জল যখন পানের উপযুক্ত নয়। থাকার মধ্যে আছে এক ভীষণ, অজ্ঞাত মৃত্যুর ভয়। জিম কার্টার এই অভিশপ্ত অরণ্যানীর মধ্যে রত্নের লোভে এসে প্রাণ দিয়েছিল, এখানে কারো মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না।

আলভারেজ কিন্তু দমে যাবার পাত্রই নয়। সে দিনের পর দিন চলল বনের মধ্যে দিয়ে। বনের কোনো কূলকিনারা পায় না শঙ্কর, আগে যাও বা ছিল, ঘূর্ণিপাকে তারা ঘুরচে শোনা অবধি, শঙ্করের দিক সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েচে।

দিন তিনেক পরে ওরা একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হল, সেখানে রিখটারসভেল্ডের একটি শাখা আসল পর্বতমালার সঙ্গে সমকোণ করে উত্তর দিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে। খুব কম হলেও সেটা চার হাজার ফুট উঁচু। আরও পশ্চিম দিকে একটা

খুব উঁচু পর্বতচূড়া ঘন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার উপত্যকা তিন মাইল বিস্তীর্ণ হবে এবং এই উপত্যকা খুব ঘন জঙ্গলে ভরা।

বনে গাছপালার যেন তিনটে চারটে থাক। সকলের উপরের থাকে শুধুই পরগাছা আর শেওলা, মাঝের থাকে ছোট বড় বনস্পতির ভিড়, নিচের থাকে ঝোপঝাপ, ছোট-ছোট গাছ। সূর্যের আলোর বালাই নেই বনের মধ্যে।

আলভারেজ বনের মধ্যে না ঢুকে বনের ধারেই তাঁবু ফেলতে বললে। সন্ধ্যার সময় ওরা কফি খেতে-খেতে পরামর্শ করতে বসল যে এখন কী করা যাবে। খাবার একদম ফুরিয়েচে, চিনি অনেকদিন থেকেই নেই, সম্প্রতি দেখা যাচ্চে আর দু-এক দিন পরে কফিও শেষ হবে। সামান্য কিছু ময়দা এখনো আছে—কিন্তু আর কিছুই নেই। ময়দা এই জন্যে আছে যে, ওরা ও জিনিসটা কালেভদ্রে ব্যবহার করে। ওদের প্রধান ভরসা বন্য জন্তুর মাংস, কিন্তু সঙ্গে যখন ওদের গুলি বারুদের কারখানা নেই, তখন শিকারের ভরসাই বা চিরকাল করা যায় কি করে?

কথা বলতে-বলতে শঙ্কর দূরের যে পাহাড়ের চূড়াটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে, সেদিকে মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখছিল। এই সময়ে অল্পক্ষণের জন্যে মেঘ সম্পূর্ণ সরে গেল। চূড়াটার অদ্ভুত চেহারা, যেন কুলপি বরফের আগার দিকটা কে এক কামড়ে খেয়ে ফেলেচে।

আলভারেজ বললে—এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে বুলাওয়েও কী সলস্‌বেরি চারশো থেকে পাঁচশো মাইলের মধ্যে। মধ্যে শ-তুই মাইল মরুভূমি। পশ্চিম দিকে উপকূল তিনশো মাইলের মধ্যে বটে, কিন্তু পর্তুগিজ পশ্চিম-আফ্রিকা অতি ভীষণ তুর্গম জঙ্গলে ভরা, সুতরাং সেদিকের কথা বাদ দাও। এখন আমাদের উপায় হচ্চে, হয় তুমি নয় আমি সলস্‌বেরি কি বুলাওয়েও চলে গিয়ে টোটা ও খাবার কিনে আনি। কম্পাসও চাই।

আলভারেজের মুখে এই কথাটা বড় শুভক্ষণে শঙ্কর শুনেছিল। দৈব মানুষের জীবনে যে কত কাজ করে, তা মানুষে কি সব সময় বোঝে? দৈবক্রমে 'বুলাওয়েও' ও 'সলস্‌বেরি' তুটো শহরের নাম, তাদের অবস্থানের দিক ও এই জায়গাটা থেকে তাদের আনুমানিক দূরত্ব শঙ্করের কানে গেল। এর পরে সে কতবার মনে-মনে আলভারেজকে ধন্যবাদ দিয়েছিল এই নাম তুটো বলবার জন্যে।

কথাবার্তা সেদিন বেশি অগ্রসর হল না। তুজনে পরিশ্রান্ত ছিল, সকাল-সকাল শয্যা আশ্রয় করলে।

॥ আট ॥

মাঝ রাতে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। কি একটা শব্দ হচ্ছে ঘন বনের মধ্যে, কি একটা কাণ্ড কোথায় ঘটচে বনে।

আলভারেজও বিছানায় উঠে বসেচে। দুজনেই কান-খাড়া করে শুনলে—বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কি হচ্চে বাইরে?

শঙ্কর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে বাইরে আসছিল, আলভারেজ বারণ করলে। বললে—এসব অজানা জঙ্গলে রাত্রিবেলা ও রকম তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে যেও না। তোমাকে অনেকবার সর্তক করে দিয়েচি। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্চ কোথায়?

তাঁবুর বাইরে রাত্রি ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুজনেই টর্চ ফেলে দেখলে—বন্য জন্তুর দল গাছপালা ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মত্তের মতো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পশ্চিমের সেই ভীষণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, পুবদিকের পাহাড়টার দিকে চলেচে! হায়েনা, বেবুন, বুনো মহিষ। দুটো চিতাবাঘ তো ওদের গা ঘেঁষে ছুটে পালাল। আরও আসচে, দলে-দলে আসচে। ধাড়ী ও মাদী কলোবাস বাঁদর দলে-দলে ছানাপোনা নিয়ে ছুটেচে, সবাই যেন কোনো আকস্মিক বিপদের মুখ থেকে প্রাণের ভয়ে ছুটেচে! আর সঙ্গে-সঙ্গে দূরে কোথায় একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্চে—চাপা গম্ভীর মেঘগর্জনের মতো শব্দটা, কিংবা দূরে কোথাও যেন হাজারটা জয়ঢাক একসঙ্গে বাজচে!

ব্যাপার কী! দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলে। দুজনেই অবাক! আলভারেজ বললে—শঙ্কর, আগুনটা ভালো করে জ্বালো, নয়তো বন্য জন্তুদের দল আমাদের তাঁবুসুদ্ধ ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে।

জন্তুদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে! মাথার উপরেও

পাখির দল বাসা ছেড়ে পালাচ্চে। প্রকাণ্ড একটা স্প্রিংবক হরিণের দল ওদের দশগজের মধ্যে এসে পড়ল।

কিন্তু ওরা দুজনে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েচে ব্যাপার দেখে যে, এত কাছে পেয়েও গুলি করতে ভুলে গেল। এমন ধরনের দৃশ্য ওরা জীবনে কখনো দেখেনি!

শঙ্কর আলভারেজকে কি একটা জিগগেস করতে যাবে, তারপরেই—প্রলয় ঘটল। অন্তত শঙ্করের তো তাই বলেই মনে হল। সমস্ত পৃথিবীটা দুলে এমন কেঁপে উঠল যে, ওরা দুজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে-সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন কাছেই কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল—আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাটলো।

আলভারেজ মাটি থেকে উঠবার চেষ্টা করতে-করতে বললে, ভূমিকম্প!

কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখে বিস্মিত হল, রাত্রির অমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে পঞ্চাশ হাজার বাতির এমন বিজলি আলো জ্বলে উঠল কোথা থেকে?

তারপর তাদের নজরে পড়ল দূরের সেই পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু হয়েচে। রাঙা হয়ে উঠেচে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুন-রাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠেচে পাহাড়ের চূড়ো থেকে দু-হাজার আড়াই হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতে—সঙ্গে-সঙ্গে কি বিশ্রী নিঃশ্বাস রোধকারী গন্ধকের উৎকট গন্ধ বাতাসে।

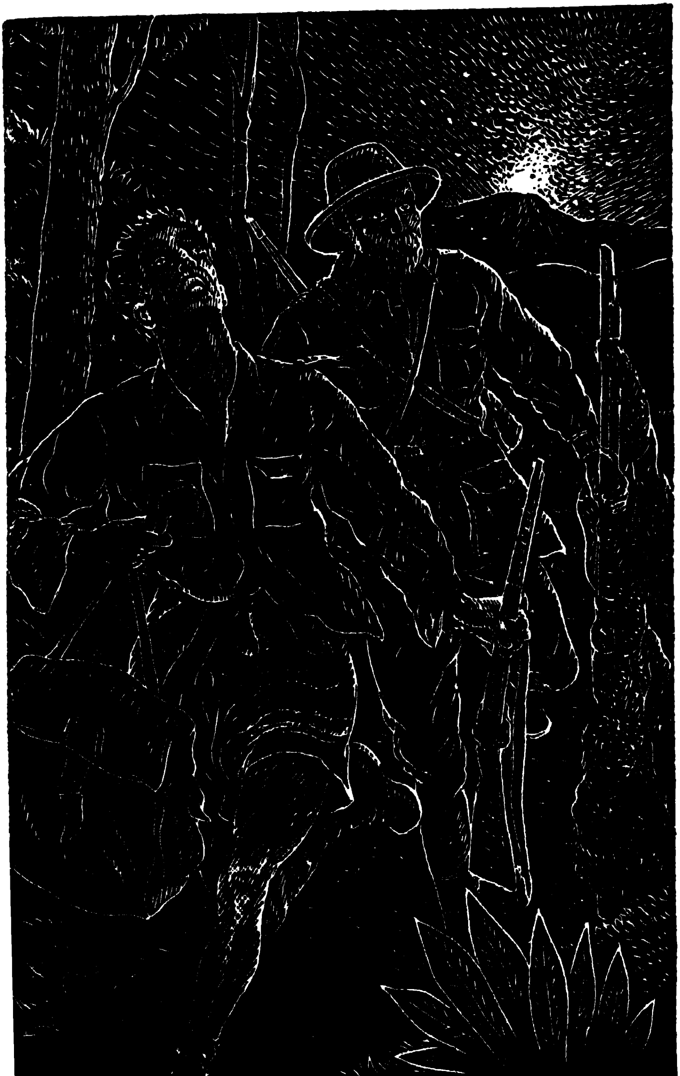
আলভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল—আগ্নেয়গিরি! সান্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা!

কি অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! ওরা কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না খানিকক্ষণ। লক্ষটা তুবড়ি এক সঙ্গে জ্বলছে, লক্ষটা রঙমশালে এক সঙ্গে আগুন দিয়েচে শঙ্করের মনে হল। রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে-মাঝে নিচু হয়ে যায়, হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ করে জ্বলে ওঠে, অমনি দপ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে। আর সেই সঙ্গে হাজারটা বোমা ফাটার আওয়াজ।

এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপচে যে, দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—কেবল টলে-টলে পড়তে হয়। শঙ্কর তো টলতে-টলতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। ঢুকে দেখে একটা ছোট কুকুরছানার মতো জীব তার বিছানায় গুটিসুটি হয়ে ভয়ে কাঁপছে। শঙ্করের টর্চের আলোয় সেটা থতমত খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দুটো মণির মতো জ্বলতে লাগল।

আলভারেজ তাঁবুতে ঢুকে দেখে বললে—নেকড়ে বাঘের ছানা। রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েছে যখন প্রাণের ভয়ে!

ওরা কেউ এর আগে প্রজ্জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখেনি, এ থেকে যে বিপদ আসতে পারে তা ওদের জানা নেই—কিন্তু আলভারেজের কথা ভালো করে শেষ হতে না হতে, হঠাৎ কি প্রচণ্ড ভারি জিনিসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সের ওজনের জ্বলন্ত



কয়লার মতো রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের উপর এসে পড়েচে, সঙ্গে-সঙ্গে ঝোপটাও জ্বলে উঠেচে। তখন আলভারেজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে—পালাও, পালাও, শঙ্কর, তাঁবু ওঠাও—শিগগির—

ওরা তাঁবু ওঠাতে-ওঠাতে আরও দু-পাঁচখানা আগুন-রাঙা জ্বলন্ত ভারি পাথর এদিক-ওদিক সশব্দে পড়ল। নিঃশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমনি ঘন গন্ধকের ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়েচে।

দৌড়···দৌড়·· দৌড়···দু-ঘণ্টা ধরে ওরা জিনিসপত্র কতক টেনে হিঁচড়ে, কতক বয়ে নিয়ে, পুবদিকের সেই পাহাড়ের নিচে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে পর্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে। আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করলে। ওরা পাহাড়ের উপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর রাত্রির অন্ধকার ঠেলে। ভোর যখন হল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে পাহাড়ের ঢালুতে বড় একটা গাছের তলায়, দুজনেই হাঁপাতে-হাঁপাতে বসে পড়ল।

সূর্য ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের যে ভীষণ সৌন্দর্য অনেকখানি কমে গেল, কিন্তু শব্দ ও পাথর পড়া যেন বাড়ল। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব মিহি ধূসরবর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়চে, গাছপালা লতাপাতার উপর দেখতে দেখতে পাতলা একপুরু ছাই জমে গেল।

সারাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চলল—আবার রাত্রি এল।

নিচের উপত্যকা-ভূমির অত বড় হেমলক গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তর বর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভীষণ সৌন্দর্য, কতদূর পর্যন্ত বন ও আকাশ, কতদূরের দিগন্ত লাল হয়ে উঠেচে পর্বতের অগ্নিকটাহের আগুনে—তখন পাথর পড়াটা একটু কেবল কমেচে। কিন্তু সেই রাঙা আগুন-ভরা বাষ্পের মেঘ তখনো সেই রকমই দীপ্ত হয়ে রয়েচে।

রাত দুপুরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ওদের তন্দ্রা ছুটে গেল—ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জ্বলন্ত পাহাড়ের চূড়ার মুণ্ডুটা উড়ে গিয়েচে। নিচের উপত্যকাতে ছাই, আগুন ও জ্বলন্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা দিলে। আলভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল। ওদের তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। পিছনের একটা উঁচু গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে।

শঙ্কর ভাবছিল—এই জনহীন আরণ্য অঞ্চলে এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও পেত না, যদি তারা না থাকত। সভ্য জগৎ জানেও না, আফ্রিকার গহন অরণ্যের এ আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব। কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে জ্বলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েচে। কুলপি বরফটাতে ঠিক যেন কে আর একটা কামড় বসিয়েচে।

আলভারেজ ম্যাপ দেখে বললে—এটা আগ্নেয়গিরি বলে ম্যাপে দেওয়া নেই। সম্ভবত বহু বছর পরে এই এর প্রথম অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা খুব অর্থপূর্ণ।

শঙ্কর বললে—কি নাম?

আলভারেজ বললে—এর নাম লেখা আছে 'ওলডোনিও লেঙ্গাই'—প্রাচীন জুলু ভাষায় এর মানে 'অগ্নিদেবের শয্যা।' নামটা দেখে মনে হয়, এ অঞ্চলের প্রাচীন লোকেদের কাছে এ পাহাড়ের আগ্নেয় প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। বোধ হয় তার পর দু-একশো বছর কিংবা তার বেশিকাল এটা চুপচাপ ছিল।

ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনা-আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্রদেব প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্যে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা আপনার এ রূপের কাছে শত হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।

॥ নয় ॥

আগ্নেয় পর্বতের অত কাছে বাস করা আলভারেজ উচিত বিবেচনা করলে না। ওলডোনিও লেঙ্গাই পাহাড়ের ধূমায়িত শিখরদেশের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, তারা আরও পশ্চিম ঘেঁষে চলতে থাকল। সেদিকের গহন অরণ্যে আগুনের আঁচটিও

লাগেনি, বর্ষার জলে সে অরণ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠেচে, ছোট-ছোট গাছপালার ও লতাঝোপের সমাবেশ। ছোট-বড় কত ঝরনাধারা ও পার্বত্যনদী বয়ে চলেচে—তাদের মধ্যে একটাও আলভারেজের পূর্বপরিচিত নয়।

এইবার এক জায়গায় ওরা এসে উপস্থিত হল, যেখানে চারিদিকেই চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট-বড় পাহাড় ও প্রত্যেক পাহাড়ের গায়েই নানা আকারের গুহা। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্য রিখটারসভেল্ডের সাধারণ দৃশ্য থেকে একটু অন্য রকম। এখানে বন তত ঘন নয়, কিন্তু খুব বড়-বড় গাছ চারিদিকে, আর যেখানে সেখানে পাহাড় ও গুহা।

একটা উঁচু ঢিপির মতো গ্রানাইটের পাহাড়ের উপর ওরা তাঁবু ফেলে রইল। এখানে এসে পর্যন্ত শঙ্করের মনে হয়েচে জায়গাটা ভালো নয়। কি একটা অস্বস্তি, মনের মধ্যে কি একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, তা সে না পারে ভালো করে নিজে বুঝতে, না পারে আলভারেজকে বোঝাতে।

একদিন আলভারেজ বললে—সব মিথ্যে শঙ্কর, আমরা এখনো বনের মধ্যে ঘুরচি। আজ সেই গাছটা আবার দেখেচি, সেই D. A. লেখা। অথচ তোমার মনে আছে, আমরা যতদূর সম্ভব পশ্চিমদিক ঘেঁষেই চলেচি আজ পনেরো দিন। কী করে আমরা আবার সেই গাছের কাছে আসতে পারি?

শঙ্কর বললে—তবে এখন কী উপায়?

—উপায় আছে। আজ রাত্রে একটা বড় গাছের মাথায়

উঠে নক্ষত্র দেখে দিকনির্ণয় করতে হবে। তুমি তাঁবুতে থেক।

শঙ্কর একটা কথা বুঝতে পারছিল না। তারা যদি চক্রাকারে ঘুরচে, তবে এই অনুচ্চ শৈলমালা ও গুহার দেশে কী করে এল? এ অঞ্চলে তো কখনো আসেনি বলেই মনে হয়। আলভারেজ এর উত্তরে বললে, গাছটাতে নাগ খোদাই দেখে সে আর কখনো তার পূর্বদিকে আসবার চেষ্টা করেনি। পূর্বদিকে মাইল দুই এলেই এই স্থানটাতেই ওরা পৌঁছত।

সে রাত্রে শঙ্কর একা তাঁবুতে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ছিল। এই একখানাই বাংলা বই সে দেশ থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে, এবং বহুবার পড়লেও সময় পেলেই আবার পড়ে।

কতদূরে ভারতবর্ষ, তার মধ্যে চিতোর, মেওয়ার, মোঘল-রাজপুতের বিবাদ! এই অজানা মহাদেশের অজানা মহা অরণ্যানীর মধ্যে বসে সে সব যেন অবাস্তব বলে মনে হয়।

তাঁবুর বাইরে হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শঙ্কর প্রথমটা ভাবলে, আলভারেজ গাছ থেকে নেমে ফিরে আসচে বোধ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এ মানুষের স্বাভাবিক পায়ের শব্দ নয়, কেউ দু-পায়ে থলে জড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘষে-ঘষে টেনে-টেনে চললে যেন এমন ধরনের শব্দ হওয়া সম্ভব। আলভারেজের উইনচেস্টার রিপিটারটা হাতের কাছেই ছিল, ও সেটা তাঁবুর দরজার দিকে

বাগিয়ে বসল। বাইরে পদশব্দটা একবার থেমে গেল—পরেই আবার তাঁবুর দক্ষিণ পাশ থেকে বাঁদিকে এল। একটা কোনো বড় প্রাণীর ঘন-ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ যেন পাওয়া গেল—ঠিক যেমন পাহাড় পার হবার সময় এক রাত্রে ঘটেছিল, ঠিক সেই রকমই।

শঙ্কর একটু ভয় খেয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে রাইফেল ছুঁড়ে বসল। একবার···তুবার।

সঙ্গে-সঙ্গে মিনিট তুই পরে দূরের গাছের মাথা থেকে প্রত্যুত্তরে তুবার রিভলবারের আওয়াজ পাওয়া গেল। আলভারেজ মনে ভেবেচে, শঙ্করের কোনো বিপদ উপস্থিত, নতুবা রাত্রে খামকা রিভলবার ছুঁড়বে কেন? বোধ হয় সে তাড়াতাড়ি নেমেই আসচে।

এদিকে চারদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজে জানোয়ারটা বোধ হয় পালিয়েচে, আর তার সাড়াশব্দ নেই। শঙ্কর টর্চ জ্বেলে তাঁবুর বাইরে এসে ভাবলে, আলভারেজকে সংকেতে গাছ থেকে নামতে বারণ করবে, এমন সময় কিছুদূরে বনের মধ্যে হঠাৎ আবার তুবার পিস্তলের আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

শঙ্কর পিস্তলের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। কিছু দূরে গিয়েই দেখলে বনের মধ্যে একটা বড় গাছের তলায় আলভারেজ শুয়ে। টর্চের আলোয় তাকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে শঙ্কর শিউরে উঠল—তার সর্বশরীর রক্তমাখা, মাথাটা বাকি

শরীরের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে, গায়ের কোটটা ছিন্নভিন্ন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। ডাকলে—আলভারেজ! আলভারেজ!

আলভারেজের সাড়া নেই। তার ঠোঁট দুটো একবার যেন নড়ে উঠল, কি যেন বলতে গেল। সে শঙ্করের দিকে চেয়েই আছে, অথচ সে চোখে যেন দৃষ্টি নেই, অথবা কেমন যেন নিস্পৃহ উদাস দৃষ্টি।

শঙ্কর ওকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে এল। মুখে জল দিল, তারপর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখে গলার নিচে কাঁধের দিকের খানিকটা জায়গায় মাংস কে যেন ছিঁড়ে নিয়েচে। সারা পিঠটারও সেই অবস্থা। কোনো এক অসাধারণ বলশালী জন্তু, তীক্ষ্ণধার নখে বা দাঁতে, পিঠখানা চিরে ফালা-ফালা করেচে।

পাশে নরম মাটিতে কোনো এক জন্তুর পায়ের দাগ—তিনটে মাত্র আঙুল সে পায়ে।

সারারাত্রি সেই ভাবেই কাটল, আলভারেজের সাড়া নেই, সংজ্ঞা নেই। সকাল হবার সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে এল। শঙ্করের দিকে বিস্ময়ের ও অচেনার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, যেন এর আগে সে কখনো শঙ্করকে দেখেনি। তারপর আবার চোখ বুজল। দুপুরের পর খুব সম্ভবত নিজের মাতৃভাষায় কি সব বকতে শুরু করল, শঙ্কর এক বর্ণও বুঝতে পারলে

না। বিকেলের দিকে সে হঠাৎ শঙ্করের দিকে চাইলে। চাইবার সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্করের মনে হল, সে ওকে চিনতে পেরেচে। এইবার ইংরিজিতে বললে—শঙ্কর! এখনো বসে আছ? তাঁবু ওঠাও, চল যাই—তারপর অপ্রকৃতিস্থের মতো নির্দেশহীন ভঙ্গীতে হাত তুলে বললে—রাজার ঐশ্বর্য লুকোনো রয়েছে ঐ পাহাড়ের গুহার মধ্যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্চি। চল আমরা যাই, তাঁবু ওঠাও, দেরি কোরো না।

এই আলভারেজের শেষ কথা।

তারপর কতক্ষণ শঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যা হল, একটু-একটু করে সমগ্র বনানী ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল।

শঙ্করের তখন চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আগে আগুন জ্বাললে, তারপর দুটো রাইফেলে টোটা ভরে, তাঁবুর দোরের দিকে বন্দুকের নল বাগিয়ে, আলভারেজের মৃতদেহের পাশে একখানা শতরঞ্চির উপর বসে রইল।

তার পর সে রাত্রে আবার নামল তেমনি ভীষণ বর্ষা। তাঁবুর কাপড় ফুঁড়ে জল পড়ে জিনিসপত্র ভিজে গেল। শঙ্কর তখন কিন্তু এমন হয়ে গিয়েচে যে, তার কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। এই ক মাসে সে আলভারেজকে সত্যিই ভালোবেসে ছিল, তার নির্ভীকতা, তার সঙ্কল্পে অটলতা, তার পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তি, তার বীরত্ব—শঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। সে আলভারেজকে নিজের পিতার মতো ভালোবাসতো। আলভারেজও তাকে তেমনি স্নেহের চোখে দেখত।

কিন্তু এসবের চেয়েও শঙ্করের বেশি মনে হচ্ছে যে, আলভারেজ শেষকালে মারা গেল সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটারই হাতে। ঠিক জিম কার্টারের মতোই।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমে তার মন ভয়ে আকুল হয়ে উঠল। সম্মুখে ভীষণ অজানা মৃত্যুদূত—ঘোর রহস্যময় তার অস্তিত্ব। কখন সে আসবে, কখন বা যাবে, কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না। ঘুমে ঢুলে না পড়ে শঙ্কর মনের বলে জেগে বসে রইল সারা রাত।

ওঃ, সে কি ভীষণ রাত্রি! যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এ রাত্রির কথা সে ভুলবে না। গাছে-গাছে, ডালে-ডালে, হাজার ধারায় বৃষ্টি পতনের শব্দ ও একটানা ঝড়ের শব্দ, অরণ্যানীর অন্য সকল নৈশ শব্দকে আজ ডুবিয়ে দিয়েচে, পাহাড়ের উপর বড় গাছ মড়-মড় করে ভেঙে পড়চে। এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে সে একা এই ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে! কালো গাছের গুঁড়িগুলো যেন প্রেতের মতো দেখাচ্চে, অত বড় ঝড় বৃষ্টিতেও জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে। সম্মুখে বন্ধুর মৃতদেহ। ভয় পেলে চলবে না। সাহস আনতেই হবে, নতুবা ভয়েই সে মরে যাবে। সাহস আনবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে রাইফেল দুটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে। একটা উইনচেস্টার, অপরটি ম্যানলিকার— দুটোরই ম্যাগাজিনে টোটা ভর্তি। এমন কোনো শরীরধারী জীব নেই, যে এই দুই শক্তিশালী অতি ভয়ানক মারণাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, আজ রাত্রে অক্ষত দেহে তাঁবুতে ঢুকতে পারে।

ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে। শঙ্কর সারারাত সজাগ পাহারা দিল। পরদিন সকালে আলভারেজের মৃতদেহ সে একটা বড় গাছের তলায় সমাধিস্থ করলে এবং দুখানা গাছের ডাল ক্রুশের আকারে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির উপর পুঁতে দিলে।

আলভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপর্টো খনি বিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা ছিল ওর নামে। তাদের শেষ পরীক্ষায় আলভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েচে। ওর কথাবার্তায় অনেক সময়েই শঙ্করের সন্দেহ হত যে, সে নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে নয়।

লোকালয় থেকে বহুদূরে এই জনহীন গহন অরণ্যে, ক্লান্ত আলভারেজের রত্নানুসন্ধান শেষ হল। তার মতো মানুষ রত্নের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে-পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গায় চিরকাল আটকে রাখতে পারত না।

দুঃসাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির উপর! সিংহ, গরিলা, হায়েনা সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবার উপরে, সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ!

॥ দশ ॥

সে দিন সে রাত্রিও কেটে গেল। শঙ্কর এখন দুঃসাহসে মরিয়া হয়ে উঠেচে। যদি তাকে প্রাণ নিয়ে এ ভীষণ অরণ্য থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে তাকে ভয় পেলে চলবে না। দুদিন সে কোথাও না গিয়ে, তাঁবুতে বসে মন স্থির করে ভাববার চেষ্টা করলে, সে এখন কি করবে। হঠাৎ তার মনে হল আলভারেজের সেই কথাটা—সলস্‌বেরি···এখান থেকে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আন্দাজ দুশো মাইল···

সলস্‌বেরি! দক্ষিণ রোডেসিয়ার রাজধানী সলস্‌বেরি। যে করে হোক, পৌঁছুতেই হবে তাকে সলস্‌বেরিতে। সে এখনো অনেকদিন বাঁচবে, তার জন্মকোষ্ঠিতে লেখা আছে। এ জায়গায় বেঘোরে সে মরবে না।

শঙ্কর ম্যাপগুলো খুব ভালো করে দেখলে। পর্টুগিজ গবর্ণমেণ্টের ফরেস্ট সার্ভের ম্যাপ, ১৮৭৩ সালের রয়েল মেরিন সার্ভের তৈরি উপকূলের ম্যাপ, ভ্রমণকারী স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ, এ বাদে আলভারেজের হাতে আঁকা ও জিম কার্টারের সইযুক্ত একখানা জীর্ণ, বিবর্ণ খসড়া নক্সা। আলভারেজ বেঁচে থাকতে সে এই সব ম্যাপ ভালো করে বুঝতে একবারও চেষ্টা করেনি, এখন এই ম্যাপ বোঝার উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। সলস্‌বেরির সোজা রাস্তা বার করতে হবে। এ স্থান থেকে তার অবস্থিতি বিন্দুর দিক

নির্ণয় করতে হবে, রিখটারসভেল্ড অরণ্যের এ গোলকধাঁধা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে—সবই এই ম্যাপগুলির সাহায্যে।

অনেক দেখবার পর শঙ্কর বুঝতে পারলে এই অরণ্য ও পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া নেই—এক আলভারেজের ও জিম কার্টারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া। তাও সেগুলি এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এত সাঙ্কেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েচে যে শঙ্করের পক্ষে তা প্রায় দুর্বোধ্য। কারণ এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে ভাগ বসায়।

চতুর্থ দিন শঙ্কর সে স্থান ত্যাগ করে আন্দাজ মতো পুব দিকে রওনা হল। যাবার আগে কিছু বনফুলের মালা গেঁথে আলভারেজের সমাধির উপর অর্পণ করলে।

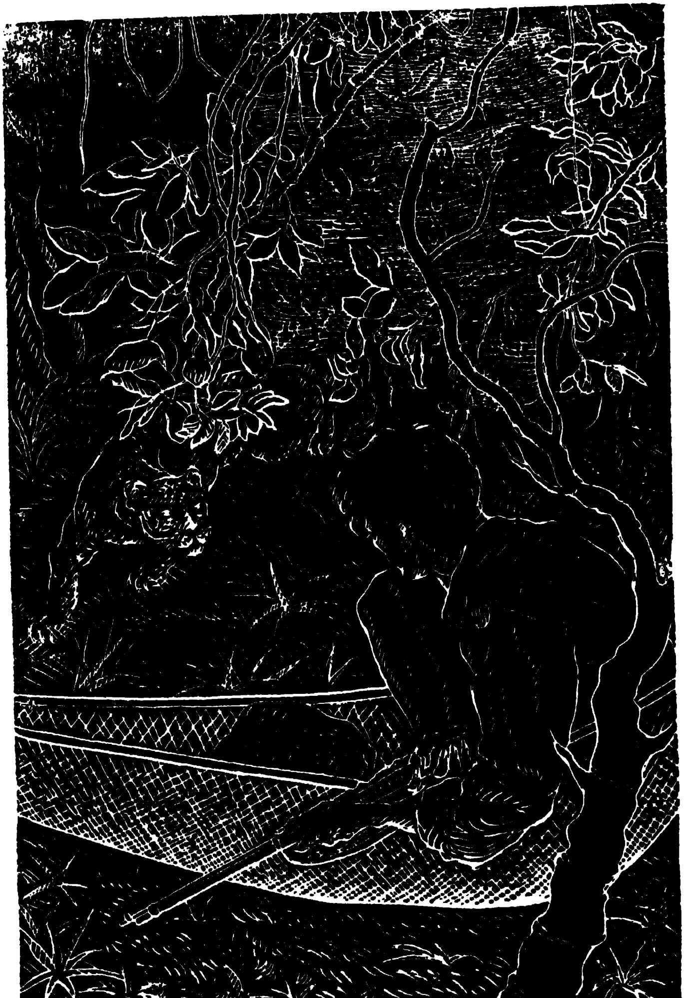
বুশ ক্রাফ্‌ট বলে একটা জিনিস আছে। সুবিস্তীর্ণ, বিজন, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময়ে এ বিদ্যা জানা না থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আলভারেজের সঙ্গে এতদিন ঘোরাঘুরি করার ফলে, শঙ্কর কিছু-কিছু বুশ ক্রাফ্‌ট শিখে নিয়েছিল, তবুও তার মনে সন্দেহ হল যে, এই বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে কি অর্জন করেচে? শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভালো থাকলে বন পার হতে পারবে, ভাগ্য প্রসন্ন না হয়—মৃত্যু!

দুটো-তিনটে ছোট পাহাড় সে পার হয়ে চলল। বন কখনো গভীর, কখনো পাতলা। কিন্তু প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বনস্পতির আর শেষ নেই। শঙ্করের জানা ছিল না যে, দীর্ঘ এলিফ্যাণ্ট ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে বনের প্রান্তসীমায় পৌছনো গিয়েচে। কারণ গভীর জঙ্গলে কখনো এলিফ্যাণ্ট বা টুসক ঘাস জন্মায় না। কিন্তু এলিফ্যাণ্ট ঘাসের চিহ্ন নেই কোনোদিকে—শুধু বনস্পতি আর নিচু বনঝোপ।

প্রথম দিন শেষ হল এক নিবিড়তর অরণ্যের মধ্যে। শঙ্কর জিনিসপত্র প্রায় সবই ফেলে দিয়ে এসেছিল, কেবল আলভারেজের ম্যানলিকার রাইফেলটা, অনেকগুলো টোটা, জলের বোতল, টর্চ, ম্যাপগুলো, কম্পাস, ঘড়ি, একখানা কম্বল ও সামান্য কিছু ওষুধ সঙ্গে নিয়েছিল—আর নিয়েছিল একটা দড়ির দোলনা। তাঁবুটা যদিও খুব হালকা ছিল, বয়ে আনা অসম্ভব বিবেচনায় ফেলেই এসেছে।

দুটো গাছের ডালে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে সে দড়ির দোলনা টাঙালে এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে গাছতলায় আগুন জ্বালালে। দোলনায় শুয়ে বন্দুক হাতে জেগে রইল, কারণ ঘুম অসম্ভব। একে ভয়ানক মশা, তার উপর সন্ধ্যার পর থেকে গাছতলার কিছুদূর দিয়ে একটা চিতাবাঘ যাতায়াত শুরু করলে। গভীর অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে যেন দুটো আগুনের ভাঁটা, শঙ্কর টর্চের আলো ফেললে পালিয়ে যায়, আবার আধঘণ্টা পরে ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে

থাকে। শঙ্করের ভয় হল, ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো বা লাফ দিয়ে দোলনায় উঠে আক্রমণ করবে। চিতাবাঘ অতি ধূর্ত জানোয়ার। কাজেই সারারাত্রি শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। তার উপর চারধারে নানা বন্য-জন্তুর রব। একবার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল বালক-বালিকার খিলখিল হাসির শব্দে তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ও চমকে জেগে উঠল। ছেলেমেয়েরা হাসে কোথায়? এই জনমানবহীন অরণ্যে বালক-বালিকাদের যাতায়াত করা বা এত রাত্রে হাসা তো উচিত নয়! পরক্ষণেই তার মনে পড়ল একজাতীয় বেবুনের ডাক ঠিক ছেলেপুলের হাসির মতো শোনায়, আলভারেজ একবার গল্প করেছিল। ভোরবেলা সে গাছ থেকে নেমে রওনা হল। বৈমানিকরা যাকে বলেন 'ফ্লাইং ব্লাইণ্ড'—সে সেইভাবে বনের মধ্যে দিয়ে চলেচে, সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, দু-চোখ বুজে। এই দুদিন চলেই সে সম্পূর্ণভাবে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েচে—আর তার উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম জ্ঞান নেই। সে বুঝলে কোনো মহারণ্যে দিক ঠিক রেখে চলা কি ভীষণ কঠিন ব্যাপার। তোমার চারপাশে সব সময়েই গাছের গুঁড়ি, অগণিত, অজস্র, তার মাপজোখ নেই। তোমার মাথার উপর সব সময় ডালপালা লতাপাতার চন্দ্রাতপ। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্যের আলোও কম, সব সময়েই যেন গোধূলি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, ঐ একই ব্যাপার। কম্পাস এদিকে অকেজো, কি করেই বা দিক ঠিক রাখা যায়।



পঞ্চম দিনে একটা পাহাড়ের তলায় এসে সে বিশ্রামের জন্যে থামল। কাছেই একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখ, একটা ক্ষীণ জলস্রোত গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এঁকে-বেঁকে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েচে।

অত বড় গুহা আগে কখনো না দেখার দরুন কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সে জিনিসপত্র বাইরে রেখে গুহার মধ্যে ঢুকল। গুহার মুখে খানিকটা আলো—ভেতরে বড় অন্ধকার, টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে, সে ক্রমশ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছুল, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আরো দুটো মুখ। উপরের দিকে টর্চ উঠিয়ে দেখলে, ছাদটা অনেকটা উঁচু। শাদা শক্ত নুনের মতো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সরু মোটা ঝুরি ছাদ থেকে ঝাড় লণ্ঠনের মতো ঝুলচে।

গুহার দেয়ালগুলো ভিজে, গা বেয়ে অনেক জায়গায় জল খুব ক্ষীণধারায় ঝরে পড়চে। শঙ্কর ডাইনের গুহায় ঢুকল, সেটা ঢুকবার সময় সরু, কিন্তু ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে পাথর নয়, ভিজে মাটি। টর্চের আলোয় ওর মনে হল, গুহাটা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের ভূমির এক কোণে আর একটা গুহামুখ। সেটা দিয়ে ঢুকে শঙ্কর দেখলে সে যেন দুধারে পাথরের উঁচু দেওয়ালওলা একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে এসেচে। গলিটা আঁকা-বাঁকা, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সাপের মতো এঁকে-বেঁকে চলেচে, শঙ্কর অনেক দূর চলে গেল গলিটা ধরে।

ঘণ্টা দুই এতে কাটল। তাপর সে ভাবলে, এবার ফেরা যাক।

কিন্তু ফিরতে গিয়ে সে আর কিছুতেই সে ত্রিভুজ গুহাটা খুঁজে পেল না। কেন, এই তো সেই গুহা থেকেই এই সরু গুহাটা বেরিয়েচে, সরু গুহা তো শেষ হয়েই গেল—তবে সেই ত্রিভুজ গুহাটা কই?

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে শঙ্করের হঠাৎ কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে গুহার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেনি তো? সর্বনাশ!

সে বসে আতঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলে, ভাবলে—না, ভয় পেলে তার চলবে না। স্থির বুদ্ধি ভিন্ন এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। মনে পড়ল, আলভারেজ তাকে বলে দিয়েছিল, অপরিচিত স্থানে বেশিদূর অগ্রসর হবার সময়ে পথের পাশে সে যেন কোনো চিহ্ন রেখে যায় যাতে আবার সেই চিহ্ন ধরে ফিরতে পারে। এ উপদেশ সে ভুলে গিয়েছিল। এখন উপায়?

টর্চের আলো জ্বালাতে আর তার ভরসা হচ্ছে না। যদি ব্যাটারি ফুরিয়ে যায়, তবে নিরুপায়। গুহার মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য। সেই অন্ধকারে এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পথ খুঁজে বার করা তো দূরের কথা।

সারাদিন কেটে গেল—ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটা। এদিকে টর্চের আলো রাঙা হয়ে আসচে ক্রমশ। ভীষণ গুমোট গরম গুহার মধ্যে, তা ছাড়া পানীয় জল নেই। পাথরের দেয়াল বেয়ে যে জল চুয়ে পড়চে, তার আস্বাদ কষা, ক্ষার, ঈষৎ লোনা। তার

পরিমাণও বেশি নয়। জিভ দিয়ে চেটে খেতে হয় দেওয়ালের গা থেকে।

বাইরে অন্ধকার হয়েচে নিশ্চয়ই, সাড়ে-সাতটা বাজল।

আটটা, নটা, দশটা। তখনো শঙ্কর পথ হাতড়াচ্চে। টর্চের পুরনো ব্যাটারি জ্বলচে সমানে বেলা তিনটে থেকে, এইবার তা এত ক্ষীণ হয়ে এসেচে যে, শঙ্কর ভয়ে আরও উন্মাদের মতো হয়ে উঠল। এই আলো যতক্ষণ, তার প্রাণের ভরসাও ততক্ষণ। নতুবা এই নরকের মতো মহা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবার কোনো আশা নেই—স্বয়ং আলভারেজও পারত না।

টর্চ নিবিয়ে ও চুপ করে একখানা পাথরের উপর বসে রইল। এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারত যদি আলো থাকত, কিন্তু এই অন্ধকারে সে কী করে এখন? একবার ভাবলে, রাত্রিটা কাটুক না, দেখা যাবে এখন। পরক্ষণেই মনে হল—তাতে আর এমন কি সুবিধে হবে? এখানে তো দিন রাত্রি সমান।

অন্ধকারেই সে দেয়াল ধরে-ধরে চলতে লাগল। হায়, হায়, কেন গুহায় ঢুকবার সময় ছুটো নতুন ব্যাটারী সঙ্গে নেয়নি। অন্তত একটা দেশলাই!

ঘড়ি হিসেবে সকাল হল। গুহার চির-অন্ধকারে কিন্তু আলো জ্বলল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শঙ্করের শরীর অবসন্ন হয়ে আসচে। বোধ হয়, এই গুহার অন্ধকারে ওর সমাধি অদৃষ্টে লেখা আছে, দিনের আলো আর তাকে দেখতে হবে না।

আলভারেজের বলি গ্রহণ করে আফ্রিকার রক্তৃষ্ণা মেটেনি, তাকেও চাই।

তিনদিন তিনরাত্রি কেটে গেল। শঙ্কর জুতোর সুকতলা চিবিয়ে খেয়েচে, একটা আরশুলা কি ইঁদুর কি কাঁকড়াবিছে গুহার মধ্যে কোনো জীব নেই যে সে ধরে খায়। মাথা ক্রমশ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আসছে, তার জ্ঞান নেই সে কি করচে বা তার কি ঘটবে—কেবল এইটুকু মাত্র জ্ঞান রয়েচে যে তাকে গুহা থেকে যে করে হোক বেরুতেই হবে, দিনের আলোর মুখ দেখতেই হবে। তাই সে অবসন্ন নির্জীব দেহেও অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়েই বেড়াচ্ছে, হয়তো মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এইরকম ভাবে হাতড়াবে।

একবার সে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে সে জেগে উঠল তা সে জানে না। দিন, রাত্রি, ঘণ্টা, ঘড়ি, দণ্ড, পল মুছে গিয়েচে এই ঘোর অন্ধকারে। হয়তো বা তার চোখ দৃষ্টি-হীন হয়ে পড়েচে, কে জানে।

ঘুমোবার পরে সে যেন একটু বল পেল। আবার উঠল, আবার চলল, আলভারেজের শিষ্য সে, নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত-পা কোলে করে বসে কখনোই মরবে না। সে পথ খুঁজবে, খুঁজবে যতক্ষণ বেঁচে আছে।

আশ্চর্য, সে নদীটাই বা গেল কোথায়? গুহার মধ্যে গোলকধাঁধায় ঘুরবার সময়ে জলধারাকে সে কোথায় হারিয়ে ফেলেচে। নদী দেখতে পেলে হয়তো উদ্ধার পাওয়াও যেতে

পারে, কারণ তার এক মুখ যেদিকেই থাক, অন্য মুখ আছে গুহার বাইরে। কিন্তু নদী তো দূরের কথা, একটা অতি ক্ষীণ জলধারার সঙ্গেও আজ তিন দিন পরিচয় নেই। জল অভাবে শঙ্কর মরতে বসেচে। কষা, লোনা, বিস্বাদ জল চেটে-চেটে তার জিভ ফুলে উঠেচে, তৃষ্ণা তাতে বেড়েচে ছাড়া কমেনি।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে শঙ্কর খুঁজতে লাগল, ভিজে দেওয়ালের গায়ে কোথাও শেওলা জন্মেছে কি না—খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। না, তাও নেই। পাথরের দেওয়াল সর্বত্র অনাবৃত, মাঝে-মাঝে ক্যালসিয়াম কর্বোনেটের পাতলা সর পড়েচে, একটা ব্যাঙের ছাতা কি শেওলা জাতীয় উদ্ভিদও নেই। সূর্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে বাঁচতে পারে না।

আরও একদিন কেটে রাত এল। এত ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে বলে তো বোধ হয় না। ওর মনে হতাশা ঘনিয়ে এসেচে। সে কি আরও চলবে, কতক্ষণ চলবে? এতে কোনো ফল নেই, এ চলার শেষ নেই। কোথায় সে চলেচে এই গাঢ় নিকষকালো অন্ধকারে এই ভয়ানক নিস্তব্ধতার মধ্যে! উঃ, কি ভয়ানক অন্ধকার, আর কি ভয়ানক নিস্তব্ধতা! পৃথিবী যেন মরে গিয়েচে, সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য নিবে গিয়েচে, সেই মৃত পৃথিবীর জনহীন, শব্দহীন, সময়হীন শ্মশানে সে-ই একমাত্র প্রাণী বেঁচে আছে।

আর বেশিক্ষণ একরকম থাকলে সে ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

॥ এগারো ॥

শঙ্কর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধহয়, কিংবা হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে থাকবে। মোটের উপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ঘড়িতে বারোটা—সম্ভবত রাত বারোটাই হবে। ও উঠে আবার চলতে শুরু করলে। এক জায়গায় তার সামনে একটা পাথরের দেওয়াল পড়ল—তার রাস্তা যেন আটকে রেখেছে। টর্চের রাঙা আলো একটিবার মাত্র জ্বালিয়ে সে দেখলে, যে দেয়াল ধরে সে এতক্ষণ যাচ্ছিল, তারই সঙ্গে সমকোণ করে এ-দেয়ালটা আড়াআড়ি ভাবে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সে কান খাড়া করলে, অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষীণ জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, ঠিক জলের শব্দই বটে, কুলু-কুলু, কুলু-কুলু, ঝরনা ধারার শব্দ—যেন পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে মাঝে-মাঝে বেধে জল বইচে কোথাও। ভালো করে শুনে ওর মনে হল, জলের শব্দটা হচ্চে এই পাথরের দেয়ালের ওপারে। দেয়ালে কান পেতে শুনে ওর ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। দেয়াল ফুঁড়ে যাবার উপযুক্ত ফাঁক আছে কিনা, টর্চের রাঙা আলোয় অনুসন্ধান করতে করতে এক জায়গায় খুব নিচু ও সংকীর্ণ প্রাকৃতিক রন্ধ্র দেখতে পেলে। সেখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা গিয়ে হাতে জল ঠেকল। সন্তর্পণে উপরের দিকে হাত দিয়ে বুঝল, সেখানটাতে দাঁড়ানো যেতে পারে। দাঁড়িয়ে উঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে

কয়েক পা যেতেই, স্রোতযুক্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবে গেল।

ঘন অন্ধকারের মধ্যেই নিচু হয়ে ও প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা জল পান করে নিলে। তারপর টর্চের ক্ষীণ আলোয় জলের স্রোতের গতি লক্ষ্য করলে। এ ধরনের নির্ঝরের স্রোতের উজানের দিকে গুহার মুখ সাধারণত হয় না। টর্চ নিবিয়ে সেই মহা নিবিড় অন্ধকারে পায়ে-পায়ে জলের ধারা অনুভব করতে-করতে অনেকক্ষণ ধরে চলল। নির্ঝর চলেচে এঁকে-বেঁকে, কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে। এক জায়গায় সেটা তিন-চারটে ছোট-বড় ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক চলে গিয়েচে, ওর মনে হল।

সেখানে এসে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। টর্চ জ্বেলে দেখলে স্রোত নানামুখী। আলভারেজের কথা মনে পড়ল, পথে চিহ্ন রেখে না গেলে, এখানে এবার গোল পাকিয়ে যাবার সম্ভবনা।

নিচু হয়ে চিহ্ন রেখে যাওয়ার উপযোগী কিছু খুঁজতে গিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ নির্মল জলধারার এপারে ওপারে দুপারেই এক ধরনের পাথরের নুড়ি বিস্তর পড়ে আছে। সেই ধরনের পাথরের নুড়ির উপর দিয়েও প্রধান জলধারা বয়ে চলেছে।

অনেকগুলো নুড়ি পকেটে নিয়ে, সে প্রত্যেক শাখা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করবে ভেবে, দুটো নুড়ি ধারার পাশে রাখতে-রাখতে গেল। একটা স্রোত থেকে খানিকদূর গিয়ে আবার অনেকগুলো ফেক্‌ড়ি বেরিয়েচে। প্রত্যেক সংযোগস্থলে ও নুড়ি সাজিয়ে একটা 'এস' অক্ষর তৈরি করে রাখলে।

অনেকগুলো স্রোতশাখা আবার ঘুরে শঙ্কর যেদিক থেকে এসেছিল. সেদিকেই যেন ঘুরে গেল। পথে চিহ্ন রেখে গিয়েও শঙ্করের মাথা গোলমাল হয়ে যাবার যোগাড় হল।

একবার শঙ্করের পায়ে খুব ঠাণ্ডা কি ঠেকতেই, আলো জেলে দেখলে, জলের ধারে এক প্রকাণ্ডকায় অজগর পাইথন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পাইথন ওর স্পর্শে আলস্য পরিত্যাগ করে মাথাটা উঠিয়ে কড়ির দানার মতো চোখে চাইতেই টর্চের আলোয় দিশেহারা হয়ে গেল—নতুবা শঙ্করের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠত। শঙ্কর জানে অজগর সাপ অতি ভয়ানক জন্তু—বাঘ সিংহের মুখ থেকেও হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে,অজগর সাপের নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। একটি বার লেজ ছুঁড়ে পা জড়িয়ে ধরলে আর দেখতে হত না।

এবার অন্ধকারে চলতে ওর ভয়ানক ভয় করছিল। কি জানি, কোথায় আবার কোন পাইথন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে! ছুটো-তিনটে স্রোতশাখা পরীক্ষা করে দেখবার পরে ও তার নিজের চিহ্নের সাহায্যে পুনরায় সংযোগ-স্থলে ফিরে এল। প্রধান সংযোগ-স্থলে ও নুড়ি দিয়ে একটি ক্রুশচিহ্ন করে রেখে গিয়েছিল। এবার ওরই মধ্যে যেটাকে প্রধান বলে মনে হল, সেটা ধরে চলতে গিয়ে দেখলে, সেও সোজামুখে যায়নি। কিছুদূর গিয়েই তারও নানা ফেক্‌ড়ি বেরিয়েচে। এক-এক জায়গায় গুহার ছাদ এত নিচু হয়ে নেমে এসেচে যে কুঁজো হয়ে, কোথাও বা মাজা দুমড়ে, অশীতিপর বৃদ্ধের ভঙ্গিতে চলতে হয়।



হঠাৎ এক জায়গায় টর্চ জ্বেলে সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও শঙ্কর বুঝতে পারলে, গুহাটা সেখানে ত্রিভুজাকৃত—সেই ত্রিভুজ গুহা, যাকে খুঁজে বার না করতে পেরে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। একটু পরেই দেখলে বহুদূরে যেন অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি নক্ষত্র জ্বলছে। গুহার মুখ! এবার আর ভয় নেই; এ-যাত্রার মতো সে বেঁচে গেল।

শঙ্কর যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন রাত তিনটে। সেখানটায় গাছপালা কিছু কম, মাথার উপর নক্ষত্রভরা আকাশ দেখা যায়। সেই মহা অন্ধকার থেকে বার হয়ে এসে রাত্রির নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ অন্ধকার তার কাছে দীপালোকখচিত নগরপথের মতো মনে হল। প্রাণভরে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে, এ অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্যে।

ভোর হল। সূর্যের আলো গাছের ডালে-ডালে ফুটল। শঙ্কর ভাবলে এ অমঙ্গলজনক স্থানে আর একদণ্ডও সে থাকবে না। পকেটে একখানা পাথরের নুড়ি তখনো ছিল, ফেলে না দিয়ে, গুহার বিপদের স্মারক স্বরূপ সেখানা সে কাছে রেখে দিল।

পরদিন এলিফ্যাণ্ট ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে, সেদিনই সন্ধ্যার আগে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিল। রাত্রে শঙ্কর অনেকক্ষণ বসে ম্যাপ দেখলে। সামনে যে মুক্ত প্রান্তরবৎ দেশ পড়ল, এখান থেকে এটা প্রায় তিনশো মাইল বিস্তৃত, একেবারে জাম্বেসি নদীর তীর পর্যন্ত। এই তিনশো মাইলের খানিকটা পড়েচে, বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে, প্রায়

১৭৫ মাইল, অতি ভীষণ, জনমানবহীন, জলহীন, পথহীন মরুভূমি। আলভারেজ মিলিটারী ম্যাপ থেকে নোট করেচে যে, এই অঞ্চলের উত্তরপূর্ব কোণ লক্ষ্য করে একটি বিশেষ পথ ধরে না গেলে মাঝামাঝি পার হতে যাওয়ার মানেই মৃত্যু। ম্যাপে এর নাম দিয়েচে 'তৃষ্ণার দেশ'! রোডেসিয়া পৌঁছুতে পারলে যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সেসব স্থানে মানুষ আছে।

শঙ্কর এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলে। পথের এই ভয়ানক অবস্থা জেনে-শুনেও সে দমে গেল না, হাত-পা-হারা হয়ে পড়ল না। এই পথে আলভারেজ একা গিয়ে সলস্‌বেরি থেকে টোটা ও খাবার কিনে আনবে বলেছিল। বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ যা পারবে বলে স্থির করেছিল, সে তা থেকে পিছিয়ে যাবে?

কিন্তু সাহস ও নির্ভীকতা এক জিনিস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ম্যাপ দেখে গন্তব্যস্থানের দিক নির্ণয় করার ক্ষমতা শঙ্করের ছিল না। সে দেখলে ম্যাপের সে কিছুই বোঝে না। মিলিটারী ম্যাপগুলোতে দু'টো মরুমধ্যস্থ কূপের জায়গায় ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড দেওয়া আছে, 'ম্যাগনেটিক্ নর্থ' আর 'ট্রু নর্থ' ঘটিত কি একটা গোলমেলে অঙ্ক কষে বার করত আলভারেজ, শঙ্কর দেখেচে কিন্তু শিখে নেয়নি।

সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় কি? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই শঙ্কর এই দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হল। ফলে, দুদিন যেতে না যেতেই শঙ্কর সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ম্যাপ দেখে যে কোনো অভিজ্ঞ লোক যে

জলাশয় চোখ বুজে খুঁজে বার করতে পারত—শঙ্কর তার তিন মাইল উত্তর দিয়ে চলে গেল, অথচ তখন তার জল ফুরিয়ে এসেচে, নতুন পানীয় জল সংগ্রহ করে না নিলে জীবন বিপন্ন হবে।

প্রথমত শুধু প্রান্তর আর পাহাড়, ক্যাকটাস্ ও ইউফোর্বিয়ার বন, মাঝে-মাঝে গ্রানাইটের স্তূপ। তারপর কি ভীষণ কষ্টের সে পথ-চলা! খাবার নেই, জল নেই, পথ ঠিক নেই, মানুষের মুখ দেখা নেই। দিনের পর দিন শুধু সুদূর শূন্য, দিগ্বলয় লক্ষ্য করে সে হতাশ পথ-যাত্রা। মাথার উপর আগুনের মতো সূর্য, পায়ের নিচে বালি পাথর যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। সূর্য উঠচে—অস্ত যাচ্ছে, নক্ষত্র উঠচে, চাঁদ উঠচে—আবার অস্ত যাচ্ছে। মরুভূমির গিরগিটি একঘেয়ে সুরে ডাকচে, ঝিঁঝি ডাকচে—সন্ধ্যায় গভীর রাত্রে।

মাইল-লেখা পাথর নেই, কত মাইল অতিক্রম করা হল তার হিসেব নেই। খাদ্য দুই-একটা পাখি, কখনো বা মরুভূমির বাজার্ড শকুনি, যার মাংস জঠর, বিস্বাদ। এমন-কি একদিন একটা পাহাড়ী বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে, যার দংশনে মৃত্যু—তাও যেন পরম সুখাদ্য, মিললে মহা সৌভাগ্য।

দুদিন ঘোর তৃষ্ণায় কষ্ট পাবার পরে পাহাড়ের ফাটলে একটা জলাশয় পাওয়া গেল। কিন্তু জলের চেহারা লাল, কতগুলো কি পোকা ভাসচে জলে, ডাঙায় কি একটা জন্তু মরে পচে ঢোল হয়ে আছে। সেই জলই আকণ্ঠ পান করে শঙ্কর প্রাণ বাঁচালে।

দিনের পর দিন কাটচে, মাস গেল, কি সপ্তাহ গেল, কি

বছর গেল হিসেব নেই। শঙ্কর শুকিয়ে রোগা হয়ে গিয়েচে, কোথায় চলেচে তার কিছুই ঠিক নেই—শুধু সামনের দিকে যেতে হবে এই সে জানে। সামনের দিকেই ভারতবর্ষ—বাংলা দেশ।

তারপর পড়ল আসল মরু কালাহারি মরুভূমির এক অংশ। দূর থেকে তার চেহারা দেখে শঙ্কর ভয়ে শিউরে উঠল। মানুষ কী করে পার হতে পারে এই অগ্নিদগ্ধ প্রান্তর! শুধুই বালির পাহাড়, আর তাম্রাভ কটা বালির সমুদ্র। ধূ-ধূ করে যেন জ্বলছে দুপুরের রোদে। মরুভূমির কিনারে, প্রথম দিনের ছায়ায় ১২৭ ডিগ্রির উত্তাপ উঠল থার্মোমিটারে।

ম্যাপে বার বার লিখে দিয়েচে, উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে ছাড়া কেউ এই মরুভূমি মাঝামাঝি পার হতে যাবে না। গেলেই মৃত্যু, কারণ সেখানে জল একদম নেই। জল যে উত্তর-পূর্ব ধারে আছে তাও নয়, তবে ত্রিশ মাইল, সত্তর মাইল ও নব্বুই মাইল ব্যবধানে তিনটি স্বাভাবিক উনুই আছে—যাতে জল পাওয়া যায়। ঐ উনুইগুলি প্রায়ই পাহাড়ের ফাটলে, খুঁজে বার করা বড়ই কঠিন। এই জন্যেই মিলিটারি ম্যাপে ওদের জায়গার অক্ষ ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে।

শঙ্কর ভাবলে, ওসব বার করতে পারব না। সেক্সটাণ্ট্ আছে, নক্ষত্রের চার্ট আছে, কিন্তু তাদের ব্যবহার সে জানে না। যা হয় হবে, ভগবান ভরসা। তবে যতদূর সম্ভব উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে যাবার চেষ্টা সে করবে।

তৃতীয় দিনে নিতান্ত দৈববলে সে একটা উনুই দেখতে পেল।

জল কাদাগোলা আগুনের মতো গরম, কিন্তু তাই তখন অমৃতের মতো দুর্লভ। মরুভূমি ক্রমে ঘোরতর হয়ে উঠল। কোনো প্রকার জীবের বা উদ্ভিদের চিহ্ন ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। আগে রাত্রে আলো জ্বাললে দু-একটা কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে আসত, ক্রমে তাও আর আসে না।

দিনে উত্তাপ যেমন ভীষণ, রাত্রে তেমনি শীত। শেষ রাত্রে শীতে হাত-পা জমে যায় এমন অবস্থা, অথচ ক্রমশ আগুন জ্বালবার উপায় গেল, কারণ জ্বালানি কাঠ আর একেবারেই নেই। কয়েক দিনের মধ্যে সঞ্চিত জলও গেল ফুরিয়ে। সেই সুবিস্তীর্ণ বালুকাসমুদ্রে, একটি পরিচিত বালুকণা খুঁজে বার করা যতদূর সম্ভব, তার চেয়েও অসম্ভব ক্ষুদ্র হাত-দুই পরিধির এক জলের উনুই বার করা।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণার কষ্টে শঙ্কর উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। এতক্ষণে শঙ্কর বুঝেচে যে, এ ভীষণ মরুভূমি একা পার হওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল। সে এমন জায়গায় এসে পড়েচে, সেখান থেকে ফিরবার উপায়ও নেই।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির উপর উঠে সে দেখলে, চারধারে শুধুই কটা বালির পাহাড়, পূর্বদিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে গিয়েচে। পশ্চিমে সূর্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ সূর্যাস্তের আভায় লাল। কিছু দূরে একটা ছোট টিপির মতো পাহাড় এবং দূর থেকে মনে হল একটা গুহাও আছে। এ ধরনের গ্রানাইটের ছোট টিপি এদেশে সর্বত্র, ট্রান্সভাল ও রোডেসিয়ায় এদের নাম 'কোপযে'

অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। রাত্রে শীতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে শঙ্কর সেই গুহায় আশ্রয় নিলে।

এইখানে এক ব্যাপার ঘটল।

॥ বারো ॥

গুহার মধ্যে ঢুকে শঙ্কর টর্চ জ্বেলে দেখলে (নতুন ব্যাটারী তার কাছে ডজন দুই ছিল) গুহাটা ছোট, বেশ একটা ছোট-খাট ঘরের মতো, মেঝেটাতে অসংখ্য ছোট-ছোট পাথর ছড়ানো। গুহার এক কোণে চোখ পড়তেই শঙ্কর অবাক হয়ে গেল। একটা ছোট্ট কাঠের পিঁপে। এখানে কি করে এল কাঠের পিঁপে?

দু-পা এগিয়েই সে চমকে উঠল।

গুহার দেয়ালের ধার ঘেঁষে শায়িত অবস্থায় একটা শাদা নরকঙ্কাল, তার মুণ্ডুটা দেয়ালের দিকে ফেরানো। কঙ্কালের আশে-পাশে কালো-কালো থলেছেঁড়ার মতো জিনিস, বোধহয় সেগুলো পশমের কোটের অংশ। দুখানা বুট জুতো কঙ্কালের পায়ে তখনো লাগানো। একপাশে একটা মরচে-পড়া বন্দুক।

পিঁপেটার পাশে একটা ছিপি-আঁটা বোতল। বোতলের মধ্যে একখানা কাগজ, ছিপিটা খুলে কাগজখানা বার করে দেখলে তাতে ইংরিজিতে কি লেখা আছে।



পিঁপেটাতে কি আছে দেখবার জন্যে যেমনি সে সেটা নাড়াতে গিয়েচে, অমনি পিঁপের নিচ থেকে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ওর শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু হয়ে ঠেলে উঠল। বোধ হয়, ছোবল মারবার আগে সাপটা এক সেকেণ্ড দেরি করেছিল! সেই এক সেকেণ্ড দেরি করার জন্যে শঙ্করের প্রাণ রক্ষা হল। পরমুহূর্তেই শঙ্করের ·৪৫ অটো-ম্যাটিক কোল্ট গর্জন করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে অতবড় ভীষণ বিষধর স্যাণ্ড ভাইপারের মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে, রক্ত মাংস খানিকটা পিঁপের গায়ে, খানিকটা পাথরের দেয়ালে ছিটকে লাগল। আলভারেজ ওকে শিখিয়েছিল, পথে সর্বদা হাতিয়ার তৈরি রাখবে। এ উপদেশ কতবার তার প্রাণ বাঁচিয়েচে।

অদ্ভুত পরিত্রাণ! সব দিক থেকেই। পিঁপেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাতে অল্প একটু জল তখনো আছে। খুব কালো শিউ গোলার মতো রঙ বটে, তবুও জল। ছোট পিঁপেটা উঁচু করে তুলে পিঁপের ছিপি খুলে ঢক্‌ঢক্ করে শঙ্কর সেই দুর্গন্ধ কালো কালির মতো জল আকণ্ঠ পান করলে। তারপর সে টর্চের আলোতে সাপটা পরীক্ষা করলে। পুরো পাঁচ হাত লম্বা সাপটা, মোটাও বেশ। এ ধরনের সাপ মরুভূমির বালির মধ্যে শরীর লুকিয়ে শুধু মুণ্ডুটা উপরে তুলে থাকে—অতি মারাত্মক রকমের বিষাক্ত সাপ।

এইবার বোতলের মধ্যের কাগজখানা খুলে মন দিয়ে

পড়লে। যে ছোট্ট পেন্সিল দিয়ে এটা লেখা হয়েছে—বোতলের মধ্যে সেটাও পাওয়া গেল। কাগজখানাতে লেখা আছে—

আমার মৃত্যু নিকট। আজই আমার শেষ রাত্রি। যদি আমার মরণের পরে, কেউ এই ভয়ঙ্কর মরুভূমির পথে যেতে যেতে এই গুহায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত এই কাগজ তাঁর হাতে পড়বে।

আমার গাধাটা দিন দুই আগে মরুভূমির মধ্যে মারা গিয়েচে। এক পিঁপে জল তার পিঠে ছিল, সেটা আমি এই গুহার মধ্যে নিয়ে এসে রেখে দিয়েচি, যদিও জ্বরে আমার শরীর অবসন্ন। মাথা তুলবার শক্তি নেই। তার উপর অনাহারে শরীর আগে থেকেই দুর্বল।

আমার বয়স ২৬ বছর। আমার নাম আত্তিলিও গাত্তি। ফ্লোরেন্সের গাত্তি বংশে আমার জন্ম। বিখ্যাত নাবিক রিওলিনো কাভালকান্তি গাত্তি—যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে তুর্কীদের সঙ্গে লড়েছিলেন, তিনি আমার একজন পূর্বপুরুষ।

রোম ও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভবঘুরে হয়ে গেলাম সমুদ্রের নেশায়—যা আমাদের বংশগত নেশা। ডাচ-ইণ্ডিজ যাবার পথে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ ডুবি হল।

আমরা সাতজন লোক অতি কষ্টে ডাঙা পেলাম। ঘোর জঙ্গলময় অঞ্চল আফ্রিকার এই পশ্চিম উপকূল। জঙ্গলের মধ্যে

শেফুজাতির এক গ্রামে আমরা আশ্রয় নিই এবং প্রায় দুমাস সেখানে থাকি। এখানেই দৈবাৎ এক প্রকাণ্ড অদ্ভুত হীরের খনির গল্প শুনলাম। পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পার্বত্য ও ভীষণ আরণ্য অঞ্চলে নাকি এই হীরের খনি অবস্থিত।

আমরা সাতজন ঠিক করলাম এই হীরের খনি যে করে হোক, বার করতে হবেই। আমাকে ওরা দলের অধিনায়ক করলে। তারপর আমরা দুর্গম জঙ্গল ঠেলে চললাম সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পার্বত্য অঞ্চলে। সে গ্রামের কোনো লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হল না। তারা বলে, তারা কখনও সে জায়গায় যায়নি, কোথায় তা জানে না, বিশেষত এক উপদেবতা নাকি সে বনের রক্ষক। সেখান থেকে হীরে নিয়ে কেউ আসতে পারবে না।

আমরা দমবার পাত্র নই। পথে যেতে-যেতে ঘোর কষ্টে বেঘোরে দুজন সঙ্গী মারা গেল। বাকি চারজন আর অগ্রসর হতে চায় না। আমি দলের অধ্যক্ষ, গাত্তি বংশে আমার জন্ম, পিছু হটতে জানি না। যতক্ষণ প্রাণ আছে; এগিয়ে যেতে হবে এই জানি। আমি ফিরতে চাইলাম না।

শরীর ভেঙে পড়তে চাইচে। আজ রাত্রেই আসবে সে নিরবয়ব মৃত্যুদূত। বড় সুন্দর আমাদের ছোট্ট হ্রদ সেরিনো লাগ্রানো, ওরই তীরে আমার পৈতৃক প্রাসাদ, কাষ্টোলি রিঙলিনি। এতদূর থেকেও আমি সেরিনো লাগ্রানোর তীরবর্তী কমলালেবুর বাগানের লেবুফুলের সুগন্ধ পাচ্চি। ছোট্ট যে গির্জাটি পাহাড়ের নিচেই, তার রূপোর ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ পাচ্চি।

না, এসব কি আবোল-তাবোল লিখচি জ্বরের ঘোরে আসল কথাটা বলি। কতক্ষণই বা আর লিখব?

আমরা সে পর্বতমালা, সে মহাদুর্গম অরণ্যে গিয়েছিলাম। সে খনি বার করেছিলাম। যে নদীর তীরে হীরে পাওয়া যায়, এক বিশাল ও অতি ভয়ানক গুহার মধ্যে সে নদীর উৎপত্তি স্থান। আমিই সেই গুহার মধ্যে ঢুকে এবং নদীর জলের তীরে ও জলের মধ্যে পাথরের নুড়ির মতো অজস্র হীরে ছড়ানো দেখতে পাই। প্রত্যেকটি নুড়ি টেট্রাহেড্রন ক্রিস্ট্যাল, স্বচ্ছ ও হরিদ্রাভ। লণ্ডন ও আমস্টার্ডামের বাজারে এমন হীরে নেই।

এই অরণ্য ও পর্বতের সে উপদেবতাকে আমি এই গুহার মধ্যে দেখেচি—ধুনোর কাঠের মশালের আলোয়, দূর থেকে আবছায়া ভাবে। সত্যিই ভীষণ তার চেহারা। জ্বলন্ত মশাল হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে ঘেঁষেনি। এই গুহাতেই সে সম্ভবত বাস করে। হীরের খনির সে রক্ষক, এই প্রবাদের সৃষ্টি সেই জন্যেই বোধ হয় হয়েচে।

কিন্তু কি কুক্ষণেই হীরের সন্ধান পেয়েছিলাম এবং কি কুক্ষণেই সঙ্গীদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম। ওদের নিয়ে আবার যখন সে গুহায় ঢুকি, হীরের খনি খুঁজে পেলাম না। একে ঘোর অন্ধকার, মশালের আলোয় সে অন্ধকার দূর হয় না. তার উপরে বহুমুখী নদী, কোন স্রোতটার ধারা হীরের রাশির উপর দিয়ে বইচে, কিছুতেই আর বার করতে পারলাম না।

আমার সঙ্গীরা বর্বর, জাহাজের খালাসি। ভাবলে, ওদের

ফাঁকি দিলাম বুঝি। আমি একা নেব এই বুঝি আমার মতলব! ওরা কি ষড়যন্ত্র আঁটলে জানিনে, পরদিন সন্ধ্যেবেলা চারজন মিলে অতর্কিতে ছুরি খুলে আমায় আক্রমণ করলে। কিন্তু তারা জানত না আমাকে, আত্তিলিও গাত্তিকে। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বইচে আমার পূর্বপুরুষ রিওলিনি কাভালকান্তি গাত্তির, যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে ওরকম বহু বর্বরকে নরকে পাঠিয়েছিলেন। সাণ্টা কাটালিনার সামরিক বিদ্যালয়ে যখন আমি ছাত্র, আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ফেন্সার এণ্টোনিও ড্রেফুসকে ছোরার ডুয়েলে জখম করি। আমার ছোরার আঘাতে ওরা দুজনে মরে গেল, দুজন সাংঘাতিক ঘায়েল হল, নিজেও আমি চোট পেলাম ওদের হাতে। আহত বদমাইস দুটোও সেই রাত্রে ভবলীলা শেষ করল। ভেবে দেখলাম এখন এই গুহার গোলকধাঁধার ভিতর থেকে খনি খুঁজে হয়তো বার করতে পারব না। তাছাড়া আমি সাংঘাতিক আহত, আমায় সভ্যজগতে পৌঁছুতেই হবে। পূর্বদিকের পথে ডাচ উপনিবেশে পৌঁছুব বলে রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু এ পর্যন্ত এসে আর অগ্রসর হতে পারলুম না। ওরা তলপেটে ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে। সেই সঙ্গে জ্বর। মানুষের কি লোভ তাই ভাবি। কেন ওরা আমাকে মারলে? ওরা আমার সঙ্গী, একবারও তো ওদের ফাঁকি দেওয়ার কথা আমার মনে আসেনি।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরক খনির মালিক আমি, কারণ নিজের প্রাণ-বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেচি। যিনি আমার এ

লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই সভ্য মানুষ ও খৃষ্টান। তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, আমাকে তিনি যেন খৃষ্টানের উপযুক্ত কবর দেন। এই অনুগ্রহের বদলে ঐ খনির স্বত্ব তাঁকে আমি দিলাম! রানী শেবার ধনভাণ্ডারও এ খনির কাছে কিছু নয়!

প্রাণ গেল, যাক, কী করব? কিন্তু কি ভয়ানক মরুভূমি এ! একটা ঝিঁঝি পোকার ডাক পর্যন্ত নেই কোনোদিকে! এমন সব জায়গাও থাকে পৃথিবীতে! আমার আজ কেবলই মনে হচ্ছে, পপলার-ঘেরা সেরিনো লাগ্রানো হ্রদ আর দেখব না, তার ধারে যে চতুর্দশ শতাব্দীর গির্জাটা, তার সেই বড় রুপোর ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনি, পাহাড়ের উপরে আমাদের যে প্রাচীন প্রাসাদ কাস্টেলি রিওলিনি, মুখদের দুর্গের মতো দেখায়, দূরে আমব্রিয়ার সবুজ মাঠ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট ডোরা নদী বয়ে যাচ্ছে—যাক, আবার কি প্রলাপ বকচি।

গুহার দুয়ারে বসে আকাশের অগণিত তারা প্রাণ ভরে দেখচি শেষবারের জন্যে। সাধু ফ্রাঙ্কোর সেই সৌর স্তোত্র, মনে পড়চে—

স্তুত হোন প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থির বায়ু তরে,
ভগিনী মেদিনী তরে, নীল মেঘ তরে, আকাশের তরে,
তারকা সমূহ তরে, সুদিন কুদিন তরে, দেহের মরণ তরে।

আরেকটা কথা। আমার দুই পায়ে জুতোর মধ্যে পাঁচখানা বড় হীরে লুকনো আছে। তোমায় তা দিলাম, হে অজানা

পথিক বন্ধু। আমার শেষ অনুরোধটি ভুলো না। জননী মেরি তোমার মঙ্গল করুন।

—কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গাত্তি
১৮৮০ সাল। সম্ভবত মার্চ মাস

হতভাগ্য যুবক!

তার মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর কেটে গিয়েচে, এই তিরিশ বছরের মধ্যে এ পথে হয়তো কেউ যায়নি, গেলেও গুহাটার মধ্যে ঢোকেনি। এতকাল পরে তার চিঠিখানা মানুষের হাতে পড়ল।

আশ্চর্য এই যে কাঠের পিঁপেটাতে তিরিশ বছর পরেও জল ছিল কী করে?

কিন্তু কাগজখানা পড়েই শঙ্করের মনে হল, এই লেখায় বর্ণিত ঐটেই সেই গুহা—সে নিজে যেখানে পথ হারিয়ে মারা যেতে বসেছিল! তারপর সে কৌতূহলের সঙ্গে কঙ্কালের পায়ের জুতো টান দিয়ে খসাতেই পাঁচখানা বড়-বড় পাথর বেরিয়ে পড়ল। এ অবিকল সেই পাথরের নুড়ির মতো, যা এক পকেট কুড়িয়ে অন্ধকার গুহার মধ্যে সে পথ চিহ্ন করেছিল এবং যার একখানা তার কাছে রয়েচে। এ পাথরের নুড়ি তো সে রাশি রাশি দেখেচে গুহার মধ্যে সেই অন্ধকারময়ী নদীর জলস্রোতের নিচে, তার দুই তীরে! কে জানত যে হীরের খনি খুঁজতে সে ও আলভারেজ সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে ছ'মাস ধরে রিখটারসভেল্ড পার্বত্য অঞ্চলে

ঘুরে-ঘুরে হয়রান হয়ে গিয়েচে—এমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সেখানে গিয়ে পড়বে! হীরে যে এমন রাশি-রাশি পড়ে থাকে পাথরের নুড়ির মতো—তাই বা কে ভেবেছিল! আগে এ সব জানা থাকলে, পাথরের নুড়ি সে দু-পকেট ভরে কুড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসত।

কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ হয়ে গিয়েচে যে, সে রত্নখনির গুহা যে কোথায়, কোন দিকে, তার কোনো নক্সা করে আনেনি বা সেখানে কোনো চিহ্ন রেখে আসেনি, যাতে আবার সেটা খুঁজে নেয়া যেতে পারে। সেই সুবিস্তীর্ণ পর্বত ও অরণ্য অঞ্চলের কোন জায়গায় সেই গুহাটা দৈবাৎ সে দেখেছিল, তা কি তার ঠিক আছে, না ভবিষ্যতে সে আবার সে জায়গা বার করতে পারবে? এ যুবকও তো কোনো নক্সা করেনি, কিন্তু এ সাংঘাতিক আহত হয়েছিল রত্নখনি আবিষ্কার করার পরেই, এর ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। হয়তো এ যা বার করতে পারত নক্সা না দেখে—সে তা পারবে না।

হঠাৎ আলভারেজের মৃত্যুর পূর্বের কথা শঙ্করের মনে পড়ল। সে বলেছিল—চল যাই, শঙ্কর, গুহার মধ্যে রাজার ভাণ্ডার লুকানো আছে! তুমি দেখতে পাচ্চ না, আমি দেখতে পাচ্চি।

শঙ্কর গুহার মধ্যেই সেই নরকঙ্কালটা সমাধিস্থ করলে। পিঁপেটা ভেঙে ফেলে তারই দুখানা কাঠে মরচে-পড়া পেরেক ঠুকে ক্রশ তৈরি করলে ও সমাধির উপর সেই ক্রশটা পুঁতলে। এ ছাড়া খৃষ্টধর্মাচারীকে সমাধিস্থ করবার অন্য কোনো রীতি

তার জানা নেই। তারপরে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, এই মৃত যুবকের আত্মার শান্তির জন্য।

এসব শেষ করতে সারাদিনটা কেটে গেল। রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন আবার সে রওনা হল। কঙ্কালের চিঠিখানা ও হীরেগুলি যত্ন করে সঙ্গে নিল।

তবে তার মনে হয়, এই অভিশপ্ত হীরের খনির সন্ধানে যে গিয়েচে, সে আর ফেরেনি। আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা মরেচে, জিম কার্টার মরেচে, আলভারেজ মরেচে। এর আগেই বা কত লোক মরেচে তার ঠিক কি? এইবার তার পালা। এই মরুভূমিতেই তার শেষ, এই বীর ইটালিয়ান যুবকের মতো।

॥ তেরো ॥

দুপুরের রোদে যখন দিকদিগন্তে আগুন জ্বলে উঠল, একটা ছোট্ট পাথরের টিপির আড়ালে শঙ্কর আশ্রয় নিলে। ১৩৫ ডিগ্রি উত্তাপ উঠেচে তাপমান যন্ত্রে, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ উত্তাপে পথ হাঁটা চলে না। যদি সে কোনো রকমে এই ভয়ানক মরুভূমির হাত এড়াতে পারত, তবে হয়তো জীবন্ত অবস্থায় মানুষের আবাসেও পৌঁছতে পারত। সে ভয় করে শুধু এই মরুভূমি, সে জানে কালাহারি মরু বড়-বড় সিংহের বিচরণভূমি। তার হাতে রাইফেল আছে—রাতদুপুরেও একা যত বড় সিংহই হোক, সম্মুখীন হতে সে ভয় করে না—কিন্তু

ভয় হয় তৃষ্ণা রাক্ষসীকে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। দুপুরে সে দুবার মরীচিকা দেখলে। এতদিন মরুপথে আসতেও এ আশ্চর্য নৈসর্গিক দৃশ্য দেখেনি, বইয়েই পড়ে ছিল মরীচিকার কথা। একবার উত্তর-পূর্ব কোণে, একবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, দুই মরীচিকাই কিন্তু প্রায় এক রকম—অর্থাৎ একটা বড় গম্বুজওয়ালা মসজিদ বা গির্জা, চারপাশে খেজুরকুঞ্জ, সামনে বিস্তৃত জলাশয়। উত্তর-পূর্ব কোণের মরীচিকাটা বেশি স্পষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে দূরদিগন্তে মেঘমালার মতো পর্বতমালা দেখা গেল। শঙ্কর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। পূর্বদিকে একটাই মাত্র বড় পর্বত এখান থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব, দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রান্তবর্তী চিমানিমানি পর্বতমালা। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, সে বিশাল কালাহারি পদব্রজে পার হয়ে প্রায় শেষ করতে চলেচে? না এও মরীচিকা?

কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নারাত্রে সে দূর পর্বতের সীমারেখা তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেলে। অসংখ্য ধন্যবাদ হে ভগবান, মরীচিকা নয় তবে। জ্যোৎস্নারাত্রে কেউ কখনো মরীচিকা দেখেনি।

তবে কি প্রাণের আশা আছে? আজ পৃথিবীর বৃহত্তম রত্নখনির মালিক সে। নিজের পরিশ্রমে ও দুঃসাহসের বলে সে তার স্বত্ব অর্জন করেচে। দরিদ্র বাঙলা মায়ের বুকে সে যদি আজ বেঁচে ফেরে!

দুদিনের দিন বিকেলে সে এসে পর্বতের নিচে পৌঁছল। তখন

সে দেখলে, পর্বত পার হওয়া ছাড়া ওপারে যাওয়ার কোনো সহজ উপায় নেই। নইলে ২৫ মাইল মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে আসতে হবে। মরুভূমির মধ্যে সে আর কিছুতেই যেতে রাজী নয়। সে পাহাড় পার হয়েই যাবে।

এইখানে সে প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে। সে ভুলে গেল যে সাড়ে-বারো হাজার ফুট একটা পর্বতমালা ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিখটারসভেল্ড পার হওয়ার মতোই শক্ত। তার চেয়েও শক্ত, কারণ সেখানে আলভারেজ ছিল এখানে সে একা।

শঙ্কর ব্যাপারের গুরুত্বটা তেমন বুঝতে পারলে না, ফলে চিমানিমানি পর্বত উত্তীর্ণ হতে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসল, ভীষণ প্রজ্বলন্ত কালাহারি পার হতে গিয়েও সে এমন ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়নি।

চিমানিমানি পর্বতে জঙ্গল খুব বেশি ঘন নয়। শঙ্কর প্রথম দিন অনেকটা উঠল—তারপর একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে কোনোদিকে যাবার উপায় নেই। কোন পথটা দিয়ে উঠেছিল, সেটাও আর খুঁজে পেলে না—তার মনে হল, সে সমতলভূমির যে জায়গা দিয়ে উঠেছিল, তার ত্রিশ ডিগ্রি দক্ষিণে চলে এসেচে। কেন যে এমন হল, এর কারণ কিছুতেই সে বার করতে পারলে না। কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেল, কখনো উঠচে, কখনো নামচে, সূর্য দেখে দিক ঠিক করে নিচ্চে, কিন্তু সাত-আট মাইল পাহাড় উত্তীর্ণ হতে এতদিন লাগচে কেন?

তৃতীয় দিনে আর একটা নতুন বিপদ ঘটল। তার আগের দিন একখানা আলগা পাথর গড়িয়ে তার পায়ে চোট লেগেছিল। তখন তত কিছু হয়নি, পরদিন সকালে আর সে শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাঁটু ফুলেচে, বেদনাও খুব! দুর্গম পথে নামা-ওঠা করা এ অবস্থায় অসম্ভব। পাহাড়ের একটা ঝরনা থেকে উঠবার সময় জল সংগ্রহ করে এনেছিল, তাই একটু-একটু করে খেয়ে চালাচ্চে। পায়ের বেদনা কমে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। বেশি দূর যাওয়া চলবে না। সামান্য একটু-আধটু চলাফেরা করতেই হবে খাদ্য ও জলের চেষ্টায়, ভাগ্যে পাহাড়ের এই স্থানটা যেন খানিকটা সমতলভূমির মতো, তাই রক্ষে।

এইসব অবস্থায়, এই মনুষ্যবাসহীন পাহাড়ে বিপদ তো পদে-পদেই। একা এ পাহাড় টপকাতে গেলে যে কোনো ইউরোপীয় পর্যটকেরও ঠিক এইরকম বিপদ ঘটতে পারত।

শঙ্কর আর পারে না। ওর হৃৎপিণ্ডে কি একটা রোগ হয়েচে, একটু হাঁটলেই ধড়াস-ধড়াস করে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরায় ধাক্কা মারে। অমানুষিক পথশ্রমে, দুর্ভাবনায়, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে, কখনো বা অনাহারের কষ্টে, ওর শরীরে কিছু নেই।

চারদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। খাদ্য নেই, গতকাল থেকে। রাইফেল সঙ্গে আছে, কিন্তু একটা বন্য জন্তুর দেখা নেই। দুপুরে একটা হরিণকে চরতে দেখে ভরসা হয়েছিল, কিন্তু রাইফেলটা তখন ছিল

৫০ গজ তফাতে একটা গাছে ঠেস দেওয়া, আনতে গিয়ে হরিণটা পালিয়ে গেল। জল খুব সামান্যই আছে চামড়ার বোতলে। এ অবস্থায় নেবে সে ঝরনা থেকে জল আনবেই বা কী করে? হাঁটুটা আরও ফুলেচে। বেদনা এত বেশি যে একটু চলাফেরা করলেই মাথার শির পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়ে যন্ত্রণায়।

পরিষ্কার আকাশের নিচে জলকণাশূন্য বায়ুমণ্ডলের গুণে অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিকচক্রবালে মেঘলা করে ঘিরেচে নীল পর্বতমালা দূরে-দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে দিগন্ত বিস্তীর্ণ কালাহারী। দক্ষিণে ওয়াহকুহক পর্বত, তারও অনেক পিছনে মেঘের মতো দেখা যায় পল ক্রুগার পর্বতমালা। সলস্‌বেরির দিকে কিছু দেখা যায় না, চিমানিমানি পর্বতের এক উচ্চতর শৃঙ্গ সেদিকে দৃষ্টি আটকেচে।

আজ দুপুর থেকে ওর মাথার উপর শকুনির দল উড়চে। এতদিন এত বিপদেও শঙ্করের যা হয়নি, আজ শকুনির দল মাথার উপর উড়তে দেখে সত্যিই ওর ভয় হয়েচে। ওরা তাহলে কি বুঝেচে যে শিকার জুটবার বেশি দেরি নেই!

সন্ধ্যার কিছু পরে কি একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে, পাশেই এক শিলাখণ্ডের আড়ালে একটা ধূসর রঙের নেকড়ে বাঘ—নেকড়ের লম্বা ছুঁচলো কান দুটো খাড়া হয়ে আছে, শাদা-শাদা দাঁতের উপর দিয়ে রাঙা জিভটা অনেকখানি বার হয়ে লকলক করচে। চোখে চোখ পড়তেই সেটা চট করে পাথরের আড়াল থেকে সরে দূরে পালাল।

নেকড়ে বাঘটাও তাহলে কি বুঝেচে। পশুরা নাকি আগে থেকে অনেক কথা জানতে পারে।

হাড়-ভাঙা শীত পড়ল রাত্রে। ও কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে। অগ্নিকুণ্ডের আলো যতটুকু পড়েছে তার বাইরে ঘন অন্ধকার।

কি একটা জন্তু এসে অগ্নিকুণ্ড থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে দেহ মিশিয়ে চুপ করে বসল। কোয়োট, বন্যকুকুর জাতীয় জন্তু। ক্রমে আর একটা, আর ছুটো, আর তিনটে। রাত বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে দশ-পনেরোটা এসে জমা হল। অন্ধকারে তার চারধার ঘিরে নিঃশব্দে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে যেন কিসের প্রতীক্ষা করচে।

কি সব অমঙ্গলজনক দৃশ্য!

ভয়ে ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। সত্যিই কি এতদিনে তারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেচে। সে-ও পারলে না রিখটারসভেল্ড থেকে হীরে নিয়ে পালিয়ে যেতে!

উঃ, আজ কত টাকার মালিক সে। হীরের খনি বাদ যাক, তার সঙ্গে যে ছখানা হীরে রয়েচে, তার দাম অন্তত ছু-তিন লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই হবে। তারগরিব গ্রামে, গরিব বাপ মায়ের বাড়ি যদি সে এই টাকা নিয়ে গিয়ে উঠতে পারত! কত গরিবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারত, গ্রামের কত দরিদ্র কুমারীকে বিবাহের যৌতুক দিয়েভালো পাত্রে বিবাহ দিত, কত সহায়হীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শেষ কটা দিন নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারত।

কিন্তু যা হবার নয় কি হবে সে সব ভেবে? তার চেয়ে এই অপূর্ব রাত্রির নক্ষত্রালোকিত আকাশের শোভা, এই বিশাল পর্বত ও মরুভূমির নিস্তব্ধ গম্ভীর রূপ, মৃত্যুর আগে সেও চোখ ভরে দেখতে চায়, সেই ইটালিয়ান যুবক গাত্তির মতো। ওরা যে অদৃষ্টের এক অদৃশ্য তারে গাঁথা সবাই—আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা, জিম কার্টার, আলভারেজ, শঙ্কর।

রাত গভীর হয়েচে। কি ভীষণ শীত! একবার সে চেয়ে দেখলে, কোয়োটগুলো এরি মধ্যে কখন আরও কাছে সরে এসেচে। অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়ে তাদের চোখগুলো জ্বলচে। শঙ্কর একখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই ওরা সব দূরে সরে গেল, কিন্তু কি নিঃশব্দ ওদের গতিবিধি আর কি অসীম ওদের ধৈর্য। শঙ্করের মনে হল, ওরা জানে শিকার ওদের হাতের মুঠোয়, হাতছাড়া হবার কোনো উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলার সেই ধূসর নেকড়ে বাঘটাও দু-দুবার এসে অন্ধকারে কোয়োটদের পিছনে বসে দেখে গিয়েচে।

একটুও ঘুমুতে ভরসা হল না ওর। কী জানি, কোয়োট আর নেকড়ের দল হয়তো তাহলে জীবন্তই তাকে ছিঁড়ে খাবে মৃত মনে করে। অবসন্ন, ক্লান্ত দেহে জেগেই বসে থাকতে হবে তাকে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসলেও উপায় নেই। মাঝে-মাঝে কোয়োটগুলো এগিয়ে এসে বসে, ও জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই সরে যায়। দু-একটা হায়েনাও এসে ওদের দলে যোগ দিয়েচে, হায়েনাদের চোখগুলো অন্ধকারে কি ভীষণ জ্বলে!

কি ভয়ানক অবস্থাতে পড়েচে! জনবিরল বর্বর দেশের জনশূন্য পর্বতের সাড়ে-তিন হাজার ফুট উপরে সে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় বসে, গভীর রাত ঘোর অন্ধকার, সামান্য আগুন জ্বলছে। মাথার উপর জলকণাশূন্য স্তব্ধ বায়ুমণ্ডলের গুণে আকাশের অগণ্য তারা জ্বলজ্বল করচে যেন ইলেকট্রিক আলোর মতো, নিচে তার চারধার ঘিরে অন্ধকারে মাংসলোলুপ নীরব নেকড়ে কোয়োট হায়েনার দল।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার এটাও মনে হল, বাঙলার পাড়াগাঁয়ে



ম্যালেরিয়ায় ধুঁকে সে মরচে না। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু! পদব্রজে কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছে সে—একা। মরে গিয়ে চিমানিমানি পর্বতের শিলায় নাম খুদে রেখে যাবে। সে একজন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী ও আবিষ্কারক। অত বড় হীরের খনি সে-ই তো খুঁজে বার করেছে? আলভারেজ মারা যাওয়ার পরে সেই বিশাল অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের গোলকধাঁধা থেকে সে তো একাই বার হতে পেরে এত দূর এসেচে! এখন সে নিরুপায়, অসুস্থ, চলৎশক্তি রহিত। তবুও সে যুঝচে, ভয় তো



পায়নি, সাহস তো হারায়নি। কাপুরুষ, ভীতু নয় সে। জীবন মৃত্যু তো অদৃষ্টের খেলা। না বাঁচলে তার দোষ কি?

দীর্ঘ রাত্রি কেটে গিয়ে পুবদিক ফরসা হল। সঙ্গে-সঙ্গে বন্য জন্তুর দল কোথায় পালাল। বেলা বাড়চে, আবার নির্মম সূর্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে শুরু করচে দিক-বিদিক। সঙ্গে-সঙ্গে শকুনির দল কোথা থেকে এসে হাজির। কেউ মাথার উপর ঘুরচে, কেউ বা দূরে-দূরে গাছের ডালে কি পাথরের উপরে বসেচে, খুব ধীরভাবে প্রতীক্ষা করচে। ওরা যেন বলচে—কোথায় যাবে বাছাধন? যে কদিন লাফালাফি করবে, করে নাও। আমরা বসি, এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই আমাদের।

শঙ্করের খিদে নেই। খাবার ইচ্ছেও নেই। তবুও সে গুলি করে একটা শকুনি মারলে। রোদ ভীষণ চড়েচে, আগুন-তাতা পাথরের গায়ে পা রাখা যায় না। এ পর্বতও মরুভূমির সামিল, খাদ্য এখানে মেলে না, জলও না। সে মরা শকুনিটা নিয়ে এসে আগুন জ্বেলে ঝলসাতে বসল। এর আগে মরুভূমির মধ্যেও সে শকুনির মাংস খেয়েচে। এরাই এখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, আজ ও খাচ্চে ওদের, কাল ওরা খাবে ওকে। শকুনিগুলো এসে আবার মাথার উপর জুটেচে।

তার নিজের ছায়া পড়েচে পাথরের গায়ে, সে নির্জন স্থানে শঙ্করের উদভ্রান্ত মনে ছায়াটা যেন একজন সঙ্গী মনে হল। বোধহয়, ওর মাথা খারাপ হয়ে আসচে! কারণ বেঘোর অবস্থায়, ও কতবার নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগল,

কতবার পরক্ষণের সচেতন মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে সামলে নিল।

সে পাগল হয়ে যাচ্চে নাকি? জ্বর হয়নি তো? তার মাথার মধ্যে ক্রমশ গোলমাল হয়ে যাচ্চে সব। আলভারেজ···হীরের খনি···পাহাড়, পাহাড়, বালির সমুদ্র···আত্তিলিও গাত্তি কাল রাত্রে ঘুম হয়নি···আবার রাত আসচে, সে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

কিসের শব্দে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ আসচে কোনদিক থেকে? কোনো পরিচিত শব্দের মতো নয়। কিসের শব্দ? কোনদিক থেকে শব্দটা আসচে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু ক্রমশ কাছে আসচে সেটা।

হঠাৎ আকাশের দিকে শঙ্করের চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তার মাথার উপর দিয়ে আকাশের পথে বিকট শব্দ করে কী একটা জিনিস যাচ্চে। ওই কি এরোপ্লেন? সে বইয়ে ছবি দেখেছে বটে।

এরোপ্লেন যখন ঠিক মাথার উপর এল, শঙ্কর চিৎকার করলে, কাপড় ওড়ালে, গাছের ডাল ভেঙে নাড়লে, কিন্তু কিছুতেই পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না। দেখতে-দেখতে এরোপ্লেনখানা সুদূর ভায়োলেট রঙের পলক্রুগার পর্বতমালার মাথার উপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হয়তো আরও এরোপ্লেন যাবে এ পথ দিয়ে। কী আশ্চর্য দেখতে এই এরোপ্লেন জিনিসটা। ভারতবর্ষে থাকতে সে একখানাও দেখেনি।

শঙ্কর ভাবলে আগুন জ্বালিয়ে কাঁচা ডাল পাতা দিয়ে সে যথেষ্ট ধোঁয়া করবে। যদি আবার এপথে যায়, পাইলটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ধোঁয়া দেখে। একটা সুবিধে হয়েচে, এরোপ্লেনের ঐ বিকট আওয়াজে শকুনির দল কোনদিকে ভেগেচে যেন।

সেদিন কাটল। দিন কেটে রাত্রি হবার সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্করের দুর্ভোগ শুরু হল। আবার গত রাত্রির পুনরাবৃত্তি। সেই কোয়োটের দল আবার এল। আগুনের চারধারে তারা আবার তাকে ঘিরে বসল। নেকড়ে বাঘটা সন্ধ্যা না হতেই দূর থেকে একবার দেখে গেল। গভীর রাত্রে আর একবার এল।

কিসে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আওয়াজ করতে ভরসা হয় না—টোটা মাত্র দুটি বাকি। টোটা ফুরিয়ে গেলে তাকে অনাহারে মরতে হবে। মরতে তো হবেই, তবে দুদিন আগে আর পরে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

কিন্তু আওয়াজ তাকে করতেই হল। গভীর রাত্রে হায়েনা-গুলো এসে কোয়োটদের সাহস বাড়িয়ে দিলে। তারা আরও সরে এগিয়ে এসে তাকে চারধার থেকে ঘিরলে। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারলে আর ভয় পায় না।

একবার একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল—বসে-বসেই ঢুলে পড়েছিল। পর মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে দেখলে, নেকড়ে বাঘটা অন্ধকার থেকে পা টিপে-টিপে তার অত্যন্ত কাছে এসে পড়েচে। ওর ভয় হল, হয়তো ওটা ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভয়ের চোটে একবার গুলি ছুঁড়লে।

আরেকবার শেষ রাতের দিকে ঠিক এ রকমই হল। কোয়োটগুলোর ধৈর্য অসীম, সেগুলো চুপ করে বসে থাকে মাত্র, কিছু বলে না। কিন্তু নেকড়ে বাঘটা ফাঁক খুঁজচে।

রাত ফরসা হবার সঙ্গে-সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মতো অন্তর্হিত হয়ে গেল কোয়োট, হায়েনা ও নেকড়ের দল। সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্করও আগুনের ধারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা কিসের শব্দে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল।

খানিকটা আগে খুব বড় একটা আওয়াজ হয়েছে কোনো কিছুর। শঙ্করের কানে তার রেশ এখনো লেগে আছে।

কেউ কি বন্দুকের আওয়াজ করেচে? কিন্তু তা অসম্ভব, এই দুর্গম পর্বতের পথে কোন মানুষ আসবে?

একটিমাত্র টোটা অবশিষ্ট আছে। শঙ্কর ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, সেটা খরচ করে একটা আওয়াজ করলে। যা থাকে কপালে, মরেচেই তো। উত্তরে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল।

আনন্দে ও উত্তেজনায় শঙ্কর ভুলে গেল যে তার পা খোঁড়া, ভুলে গেল যে একটানা বেশিদূর সে যেতে পারে না। তার আর টোটা নেই, সে আর বন্দুকের আওয়াজ করতে পারলে না কিন্তু প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল। গাছের ডাল ভেঙে নাড়তে লাগল, আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোর সন্ধানে চারদিকে আকুল-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল।

ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক জরিপ করবার দল, কিম্বার্লি থেকে

কেপটাউন যাবার পথে, চিমানিমানি পর্বতের নিচে কালাহারি মরুভূমির উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁবু ফেলেছিল। সঙ্গে সাতখানা ডবল টায়ার ক্যাটারপিলার চাকা বসানো মোটর গাড়ি, এদের দলে নিগ্রো-কুলি ও চাকর-বাকর বাদে ন'জন ইউরোপীয়। জন চারেক হরিণ শিকার করতে উঠেছিল চিমানিমানি পর্বতের প্রথম ও নিম্নতম থাকটাতে।

হঠাৎ এ জনহীন অরণ্যপ্রদেশে সভ্য রাইফেলের আওয়াজ শুনে ওরা বিস্মিত হয়ে উঠল। কিন্তু পুনরায় ওদের আওয়াজের প্রত্যুত্তর না পেয়ে ইতস্তত খুঁজতে বেরিয়ে দেখতে পেলে, সামনের একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর চুড়ো থেকে, এক জীর্ণ ও কঙ্কালসার কোটরগতচক্ষু প্রেতমূর্তি উন্মাদের মতো হাত-পা নেড়ে তাদের কি বোঝাবার চেষ্টা করচে। তার পরনে ছিন্নভিন্ন অতি মলিন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ।

ওরা ছুটে গেল। শঙ্কর আবোল-তাবোল কি বকলে, ওরা ভালো বুঝতে পারলে না। যত্ন করে ওকে নামিয়ে পাহাড়ের নিচে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ওর জিনিসপত্র নামিয়ে আনা হয়েছিল। ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু এই ধাক্কায় শঙ্করকে বেশ ভুগতে হল। ক্রমাগত অনাহারে, কষ্টে, উদ্বেগে, অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণের ফলে, তার শরীর খুব জখম হয়েছিল, সেই রাত্রেই তার বেজায় জ্বর এল।

জ্বরে সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ল, কখন যে মোটর গাড়ি ওখান থেকে ছাড়ল, কখন যে তারা সল্‌স্‌বেরিতে পৌঁছল,

শঙ্করের কিছুই খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় পনেরো দিন সে সলস্‌বেরির হাসপাতালে কাটিয়ে দিলে। তারপর ক্রমশ সুস্থ হয়ে, মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরের রাজপথে এসে দাঁড়াল।

॥ চোদ্দ ॥

সলস্‌বেরি! কত দিনের স্বপ্ন!

আজ সে সত্যিই বড় একটা ইউরোপীয় ধরনের শহরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বড়-বড় বাড়ি, ব্যাঙ্ক, হোটেল, দোকান, পিচঢালা চওড়া রাস্তা, একপাশ দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রাম চলচে, জুলু রিকসাওয়ালা রিকসা টানচে, কাগজওয়ালা কাগজ বিক্রি করচে। সবই যেন নতুন, যেন এসব দৃশ্য জীবনে কখনও সে দেখেনি।

লোকালয়ে তো এসেচে, কিন্তু একেবারে কপর্দকশূন্য। এক পেয়ালা চা খাবার পয়সাও তার নেই। কাছে একটা ভারতীয় দোকান দেখে তার বড় আনন্দ হল। কতদিন যে দেখেনি স্বদেশবাসীর মুখ! দোকানদার মেমন মুসলমান, সাবান ও গন্ধদ্রব্যের পাইকারী বিক্রেতা। খুব বড় দোকান। শঙ্করকে দেখেই সে বুঝলে এ দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত। নিজে দুটাকা সাহায্য করলে ও একজন বড় ভারতীয় সওদাগরের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলে।

টাকা দুটি পকেটে নিয়ে শঙ্কর আবার পথে এসে দাঁড়াল।

আসবার সময় বলে এল—অসীম ধন্যবাদ টাকা ছুটির জন্যে, এ আমি আপনার কাছে ধার নিলাম, আমার হাতে পয়সা এলে আপনাকে কিন্তু এ টাকা নিতে হবে। সামনেই একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁ। সে ভালো কিছু খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না, কতদিন সভ্যখাদ্য মুখে দেয়নি। সেখানে ঢুকে এক টাকার পুরি, কচুরি, হালুয়া, মাংসের চপ, কেক, পেট ভরে খেলে। সেই সঙ্গে দু-তিন পেয়ালা কফি।

চায়ের টেবিলে একখানা পুরনো খবরের কাগজের দিকে তার নজর পড়ল। তাতে এক জায়গায় হেড লাইনে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—

ন্যাশনাল পার্ক জরিপ-দলের বিচিত্র অভিজ্ঞতা

———

মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় শ্রান্ত এক ভারতীয় আবিষ্কার

—

তার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনী

শঙ্কর দেখলে, তার একটা ফটোও ছাপা হয়েচে কাগজে। তার মুখে সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা গল্পও দেওয়া হয়েছে। এ রকম গল্প সে কারো কাছে করেনি।

খবরের কাগজখানার নাম সলস্‌বেরি ডেলি ক্রনিকল। সে খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে। তার চারপাশে ভিড় জমে গেল। ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে রিপোর্টারের দল অনেক চেষ্টা করেছিল জানা গেল। সেখানে

চিমানিমানি পর্বতে পা-ভেঙে পড়ে থাকার গল্প বলে ও ফটো তুলতে দিয়ে শঙ্কর পঞ্চাশ টাকা পেলে। তা থেকে সে আগে সেই সহৃদয় মুসলমান দোকানদারের টাকা ছুটি দিয়ে এল।

আগ্নেয়গিরিটার সম্বন্ধে সে কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখলে। তাতে আগ্নেয়গিরিটার নামকরণ করলে মাউণ্ট আলভারেজ। তবে মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যে লুকানো এত বড় একটা আস্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির এই গল্প—কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে না। অবিশ্যি রত্নের গুহার বাষ্পও সে কাউকে জানতে দেয়নি। দিলে দলে-দলে লোক ছুটবে ওর সন্ধানে।

তারপরে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে এক রাশ ইংরেজী বই ও মাসিক পত্রিকা কিনলে। বই পড়েনি কতকাল! সন্ধ্যায় একটা সিনেমায় ছবি দেখলে। কতকাল পরে, রাত্রে হোটেলের ভালো বিছানায় ইলেকট্রিক আলোর তলায় শুয়ে বই পড়তে-পড়তে সে মাঝে-মাঝে জানালা দিয়ে নিচের প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর স্ট্রীটের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। ট্রাম যাচ্চে নিচ দিয়ে, রিকসা যাচ্ছে, ভারতীয় কফিখানায় ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজচে, মাঝে-মাঝে ছু-চারখানা মোটরও যাচ্চে। এর সঙ্গে মনে হল আরেকটা ছবি— সামনে আগুনের কুণ্ড, কিছুদূরে বৃত্তাকারে ঘিরে বসে আছে কোয়োট ও হায়েনার দল। ওদের পিছনে নেকড়েটার ছুটো গোল-গোল চোখ আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলচে অন্ধকারের মধ্যে।

কোনটা স্বপ্ন? চিমানিমানি পর্বতে যাপিত সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি, না আজকের এই রাত্রি?

ইতিমধ্যে সলস্‌বেরিতে শঙ্কর একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠেচে।

রিপোর্টারের ভিড়ে তার হোটেলের হল্‌ সব সময়ে ভর্তি। খবরের কাগজের লোক আসে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাপবার কনট্রাক্ট করতে, কেউ আসে ফটো নিতে।

আত্তিলিও গাত্তির কথা সে ইটালিয়ান কনসাল জেনারেলকে জানাল। তাঁর অফিসের পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেল, আত্তিলিও গাত্তি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান যুবক ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসে পর্টুগিজ পশ্চিম-আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ ডুবি হবার পর নামে। তারপর যুবকটির আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। তার আত্মীয়-স্বজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক। ১৮৯০-৯৫ সাল পর্যন্ত তারা তাদের নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়ের সন্ধানের জন্যে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার কনস্যুলেট অফিসকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করাও হয়েছিল তার সন্ধানের জন্য। ১৮৯৫ সাল থেকে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

পূর্বোক্ত মুসলমান দোকানদারটির সাহায্যে সে ব্ল্যাকমুন স্ট্রীটের বড় জহুরী রাইডাল ওমরস্‌বির দোকানে চারখানা পাথর সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করলে। বাকি দুখানার দর আরও বেশি উঠেছিল, কিন্তু শঙ্কর সে দুখানা পাথর তার মাকে দেখাবার জন্যে দেশে নিয়ে যেতে চায়। এখন বিক্রি করবার তার ইচ্ছে নেই।

নীল সমুদ্র।

বম্বেগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পর্টুগিজ পূর্ব-আফ্রিকার বেইরা বন্দরের নারিকেলবনশ্যাম তীরভূমিকে মিলিয়ে যেতে দেখতে-দেখতে শঙ্কর ভাবছিল তার জীবনের এই এ্যাডভেঞ্চারের কথা। এই তো জীবন, এইভাবেই তো জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে। মানুষের আয়ু মানুষের জীবনের ভুল মাপকাঠি। দশ বছরের জীবন উপভোগ করেচে সে এই দেড় বছরে। আজ সে শুধু একজন ভবঘুরে পথিক নয়, একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ-আবিষ্কারক। মাউণ্ট আলভারেজকে সে জগতে প্রসিদ্ধ করবে। দূরে ভারত মহাসমুদ্রের পারে জননী জন্মভূমি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জন্য এখন মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেচে। তার মন উৎসুক হয়ে আছে, কবে দূর থেকে বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চুড়োটা মাতৃভূমির উপকূলের সান্নিধ্য ঘোষণা করবে। তারপর, বাউল কীর্তনগান মুখরিত বাঙলাদেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল গ্রামটি, সামনে আসচে বসন্তকাল, পল্লীপথে যখন একদিন সজনে ফুলের দল পথ বিছিয়ে পড়ে থাকবে, বৌ-কথা-ক ডাকবে ওদের বড় বকুল গাছটায়, নদীর ঘাটে লাগবে গিয়ে ওর ডিঙি।

বিদায়, আলভারেজ বন্ধু! স্বদেশে ফিরে যাওয়ার এই আনন্দের মুহূর্তে তোমার কথাই মনে হচ্চে আজ। তুমি সেই দলের মানুষ, সারা আকাশ যাদের ঘরের ছাদ, সারা পৃথিবী

যাদের পায়ে চলার পথ। আশীর্বাদ কোরো তোমার মহারণ্যের নির্জন সমাধি থেকে, যেন তোমার মতো হতে পারি জীবনে, অমনি সুখ-দুঃখে নিস্পৃহ, অমনি নির্ভীক।

বিদায়, বন্ধু আত্তিলিও গাত্তি! অনেক জন্মের বন্ধু ছিলে তুমি।

তোমরা সবাই মিলে শিখিয়েছ চীন দেশের সেই প্রাচীন ছড়াটি কত সত্য—

ছাদের আলসের চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক পাথর হয়ে ভেঙে যাওয়া অনেক ভালো, অনেক ভালো, অনেক ভালো।

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে। এখন জন্মভূমির টান বড় টান। এখন জন্মভূমির কোলে সে কিছুদিন কাটাবে। তারপর দেশেই সে কোম্পানী গঠন করবার চেষ্টা করবে—আবার সুদূর রিখটারসভেল্ড পর্বতে ফিরবে রত্নখনির অনুসন্ধানে —খুঁজে সে বার করবেই!

॥ পরিশিষ্ট ॥

সলসবেরি থাকতে শঙ্কর সাউথ রোডেসিয়ান মিউজিয়মের কিউরেটর প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ ডক্টর ফিটজেরাল্ডের সঙ্গে দেখা করেছিল, বিশেষ করে বুনিপের কথাটা তাঁকে বলবার জন্যে। দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পরে ডক্টর ফিটজেরাল্ডের কাছ থেকে নিম্নলিখিত পত্রখানা সে পায় :

THE SOUTH RHODESIAN MUSEUM

SALISBURY, RHODESIA, SOUTH AFRICA

JANUARY 12, 1911

Dear Mr. Choudhuri

I am writing this letter to fulfil my promise to you to let you know what I thought about your report of a strange three toed monster in the wilds of the Richtersveldt Mountains. On looking up my files I find other similar accounts by explorers who had been to the region before you, specially by Sir Robert Mc Culloch, the famous naturalist, whose report has not yet been published, owing to his sudden and untimely death last year. On thinking the matter over, I am inclined to belive that the monster you saw was nothing more than a species of anthropoid ape, closely related to the gorilla, but much

bigger in size and more savage than the specimens found in the Ruwenzori and Virunga Mountains. This species is becoming rarer and rarer every day, and such numbers as do exist are not easily to be got at on account of their shyness and the habit of hiding themselves in the depths of the high-altitude rain forests of the Richtersveldt. It is only the very fortunate traveller who gets glimpses of them, and I should think that in meeting them he runs risks proportionate to his good luck.

Congratulating you on both your luck and pluck.

I remain, Yours sincerely

(Sd) J. G. FITZGERALD

॥ সমাপ্ত ॥